পরিশেষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশীর্ব্বাদ

শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন

করকমলে—

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রস-বন্যাবেগে ;
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সঙ্গীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে ;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘ-জটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল ; কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যুষে দিনের অন্তে রাখে তারি পরে
আলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্ব্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গ-বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্ব্বাদ ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র

১

২

পরিশেষ

প্রণাম

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম্ম-বাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে-প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
তুলিল হিল্লোল দোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ-ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্ব্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হোলো অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্ম্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে

আমন্ত্রণ করেছিনু তা'রে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্চ্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তা'রে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক-বন্দনা-মন্ত্র জপে—আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তা'রে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর-কোরক মাঝে স্বপ্ন-স্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি'
পূজার নৈবেদ্য ডালি, সংশয়িত তা'হার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরী কলস্বনা।
চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ-গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যসনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কল রল-রোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দ বেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।
এই গীতি পথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ;—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম্ম-বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম ॥

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি-বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই ক'রে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে;
লক্ষ্যহারা মিলিল তা'রা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে॥
নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইসারা তারি লাগিত মোর প্রাণে,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কী বলে তা'রা কে বলো তাহা জানে!
অর্থহারা সুরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
ঝলিত মনে অবাক বাণী,
শিশির যেন তৃণে।

প্রভাত-আলো উঠিত কেঁপে
পুলকে কাঁপা বুকে,
বারণহীন নাচিত হিয়া
কারণহীন সুখে ॥

জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।
প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে
বাজালে তুমি বীণ,
ব্যথায় মোর জাগায়ে দিয়ে
তারের রিণিরিণ্।
পালের পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপূর্ব্বেরি কূলে ॥
চৈত্রমাসে শুক্ল নিশা
জুঁহি বেলির গন্ধে মিশা ;
জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
অনিদ্রারে আকুল করি তোলে।
যৌবনে সে উতল রাতে
করুণ কার চোখে
মোহিনী রাগে মিলাতে মীড়
চাঁদের ক্ষীণালোকে।

কাহার ভীরু হাসির পরে
মধুর দ্বিধা ভরি'
সরমে-ছোঁওয়া নয়ন জল
কাঁপাতে থরথরি ॥

হঠাৎ কভু জাগিয়া উঠি'
ছিন্ন করি' ফেলেছ টুটি'
নিশীথিনীর মৌন যবনিকা,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হেনেছ তা'রে বজ্রানল-শিখা।
গভীর রবে হাঁকিয়া গেছ
"অলস থেকো না গো।"
নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া,
বলেছ "জাগো, জাগো।"
বাসর ঘরে নিবালে দীপ,
ঘুচালে ফুল হার,
ধূলি-আঁচল তুলায়ে ধরা
করিল হাহাকার ॥

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে.
কখনো পূজা শোভন শতদলে,—
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।
ফসল যত উঠেছে ফলি'
বক্ষ বিভেদিয়া
কণা-কণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।

তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে।
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি'
নিঃস্ব-করা দানে॥

৭ বৈশাখ, ১৩৩৪

জন্মদিন

রবি-প্রদক্ষিণ পথে জন্মদিবসের আবর্ত্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
লহ মালাখানি।

উগ্র তব তপের আসন,
সেথায় তোমারে সম্ভাষণ
করেছিনু দিনে দিনে কঠিন স্তবনে
কখনো মধ্যাহ্নরৌদ্রে কখনো বা ঝঞ্ঝার পবনে।
এবার তপস্যা হতে নেমে এসো তুমি
দেখা দাও যেথা তব বনভূমি

ছায়াঘন, যেথা তব আকাশ অরুণ
আষাঢ়ের আভাসে করুণ।
অপরাহ্ন যেথা তার ক্লান্ত অবকাশে
মেলে শূন্য আকাশে আকাশে
বিচিত্র বর্ণের মায়া ; যেথা সন্ধ্যাতারা
বাক্যহারা
বাণীবহ্নি জ্বালি'
নিভৃতে সাজায় ব'সে অনন্তের আরতির ডালি।
শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা
সহজ আতিথ্যে বসুন্ধরা
যেথা স্নিগ্ধ শান্তিময় ;
যেথা তার অফুরান মাধুর্য্য সঞ্চয়
প্রাণে প্রাণে
বিচিত্র বিলাস আনে রূপে রসে গানে।

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক্ মোর,
ছিন্ন ক'রে দাও কর্ম্মডোর।
আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধূলায়,
পাখীর কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে সহজ গানে,
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্ব-সত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ

তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্ব্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে তন্দ্রায়,
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, "আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা ॥"

২৩ বৈশাখ, ১৩৩৮

পান্থ

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,

ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভ ক্ষতি কান্না হাসি,—
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীরে ভাঙিয়া ভাঙিয়া;
সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র; অস্তসূর্য্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায়; সে-তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরী
ভাসায় মাধুরীডালি,
পাখী তার গান দেয় ঢালি।
সে তরঙ্গ-নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ মিলন গ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,

চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্ব্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্ব্বে পর্ব্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

২৪ বৈশাখ, ১৩৩৮

অপূর্ণ

যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে,
স্পর্শের যে ক্ষুধা ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহ্বানে,
উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের,
ব্রত তার বস্তু সন্ধানের,
মনের যে ক্ষুধা চাহে ভাষা,
সঙ্গের যে ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা,
যে ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাগি
অন্তরে গোপনে রয় জাগি
সবে তারা মিলি নিতি নিতি
নানা আকর্ষণ বেগে গড়ি তোলে মানস-আকৃতি।
কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত না সংশয় তর্ক, কত না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—
মন-গড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিনে ভেঙে করে ঢেলা,

অতীতের বোঝা হতে আবর্জ্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত না আদেশ
দেহহীন তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্ত্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি,
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত না আকাশ-যাত্রা কল্প-পক্ষভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্ম-বিড়ম্বনা,
কত জয় কত পরাভব
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালো মন্দ শাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্ত্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয় ॥
জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথনির কর্ম্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,
আরব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ
তুমি-রূপে পুঞ্জ হয়ে, শেষে
কয়দিন পূর্ণ করি কোথা গিয়ে মেশে।
যে চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতি-হারা,
সে কিসের লাগি,—
নিদ্রায় আবিল কভু, কখনো বা জাগি
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি দিল সীমা,
গড়িল প্রতিমা।

অসংখ্য এ রচনায় উদ্ঘাটিছে মহা ইতিহাস,—
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস ॥
জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য ক'রে জানা।
আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদ্‌গদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ-আগ্রহে,
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।
তোমার যে সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন?
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয় ॥

দার্জ্জিলিং
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

আমি

আজ ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরাণে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা,
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গণ্ডী দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি।
তবে কেন পড়ে মনে, নিবিড় হরষে
প্রেয়সীর দরশে পরশে
বারে বারে
পেয়েছিনু তারে
অতল মাধুরী-সিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে-আমিরে।
জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।

সে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে,
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ম্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই-আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।
দিগন্তে বাদল বায়ুবেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি'।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্ত্তি ধরে।
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে-বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্ব্বত্রগামীরে॥

২৮ মাঘ, ১৩৩৭

তুমি

সূর্য্য যখন উড়ালো কেতন

অন্ধকারের প্রান্তে,

তুমি আমি তার রথের চাকার

ধ্বনি পেয়েছিনু জান্‌তে।

সেই ধ্বনি ধায় বকুল শাখায়

প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,

সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায়

আকাশপথের পান্থে।

অরুণরথের সে ধ্বনি, পথের

মন্ত্র শুনায়ে দিলে

তাই পায়ে পায় দোঁহার চলায়

ছন্দ গিয়েছে মিলে॥

তিমির-ভেদন আলোর বেদন

লাগিল বনের বক্ষে,

নব-জাগরণ পরশরতন

আকাশে এলো অলক্ষ্যে।

কিশলয়দল হোলো চঞ্চল,

শিশিরে শিহরি করে ঝলমল,

সুর-লক্ষ্মীর স্বর্ণকমল

তুলে বিশ্বের চক্ষে।

রক্ত রঙের উঠে কোলাহল

পলাশ কুঞ্জময়,

তুমি আমি দোঁহে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিনু আলোর জয় ॥

সঙ্গীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে,
চিনি নাহি চিনি চির-সঙ্গিনী
চলিলে আমার সঙ্গে।
চক্ষে তোমার উদিত রবির
বন্দনবাণী নীরব গভীর,
অস্তাচলের করুণ কবির
ছন্দ বসন-ভঙ্গে।
ঊষারুণ হোতে রাঙা গোধূলির
দূর দিগন্তপানে
বিভাসের গান হোলো অবসান
বিধুর পূরবী-তানে ॥

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদ্‌গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।
মোর ফাল্গুন হারায় যখন
আশ্বিনে ফিরে লহ।
তব অপরূপে মোর নব রূপ
তুলাইছ অহরহ ॥

আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী,
বনবাণী হোলো শান্ত।
জলভরা ঘটে চলে নদীতটে
বধূর চরণ ক্লান্ত।
নিখিলে ঘনালো দিবসের শোক,
বাহির আকাশে ঘুচিল আলোক,
উজ্জ্বল করি' অন্তর লোক
হৃদয়ে এলে একান্ত।
লুকানো আলোয় তব কালো চোখ
সন্ধ্যাতারার দেশে
ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠালো
জানি না কী উদ্দেশে॥
দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নব-জাগরিত বিশ্বে।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।
হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান
বিমল আঁধারে ধুয়ে দিলে প্রাণ,
দেখিনু মেলেছ তোমার নয়ান
অসীম দূর ভবিষ্যে।
অজানা তারায় বাজে তব গান
হারায় গগনতলে।
বক্ষ আমাব কাঁপে দুরু দুরু,
চক্ষু ভাসিল জলে॥
প্রেমের দিয়ালী দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি।

মোর সঙ্গীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপন-লিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এলো যে রাতি॥
চেনা মুখখানি আর নাহি জানি
আঁধারে হতেছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ,
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চাবি ধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।
শুধু ঝিল্লির ঘন ঝঙ্কার
নীরবের বুকে বাজে।
কাছে আছ তবু গিয়েছ হারায়ে
দিশাহারা নিশামাঝে॥
এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য?
তুমি যে-বীণার বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুণ্ণ?

যে-পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
সে-পথে তোমার নিবায়ো না বাতি,
আরতির দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয়॥

ন্যুয়র্ক
১৮ নবেম্বর, ১৯৩০।

আছি

বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে;
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধুলা উড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায়;
আশুক্লান্ত বেলগুলি সব শীর্ণ হয়ে আসে,
ম্লান গন্ধ কুড়িয়ে তারি ছড়িয়ে বেড়ায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে;
শুক্‌নো টগর উড়িয়ে ফেলে,
চিকন কচি অশথ পাতায় যা-খুসি তাই খেলে;

বাঁশের গাছে কী নিয়ে তার কাড়াকাড়ি,
খেজুর গাছের শাখায় শাখায় নাড়ানাড়ি ;
বটের শাখে ঘন সবুজ ছায়া-নিবিড় পাখীর পাড়ায়
হুহু করে ধেয়ে এসে ঘুঘু দুটির নিদ্রা ছাড়ায় ;
রুক্ষ কঠিন রক্ত মাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে ;
ক্ষেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দিক্‌সীমায়
অস্ফুট ঐ বাষ্প-নীলিমায় ;
টেলিগ্রাফের তারে তারে
সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ;
এমনি করে বেলা বহে যায়,
এই হাওয়াতে চুপ করে রই একলা জানালায়।
ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।
না থাক্‌ খ্যাতি, না থাক্‌ কীর্ত্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার,—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে॥

১৯ বৈশাখ, ১৩৩৮।

বালক

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুই পহরে
দ্বারের পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা,—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেলা।
দূর আকাশে ডেকে যেত চিল,
সিমুগাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলমিল।
তপ্ত তৃষায় চঞ্চু করি ফাঁক
প্রাচীর পরে ক্ষণে ক্ষণে বসত এসে কাক।
চড়ুই পাখীর আনাগোনা মুখর কলভাষা,
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা।
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায় গলির ওপার থেকে—
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে!
কখন মাঝে মাঝে
ঘড়িওয়ালা কোন বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।
সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃষ্টি-পেরিয়ে যাওয়া দূর
বাজাত কোন্ ঘর-ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।
অকারণের ভালো লাগা
অকারণের ব্যথায় মিলে গাঁথত স্বপন নাইকো গোড়া আগা।

সাথীহীনের সাথী

মনে হত দেখতে পেতেম দিগন্তে নীল আসন ছিল পাতি॥
সত্তরে আজ পা দিয়েছি আয়ুশেষের কূলে
অন্তরে আজ জান্‌লা দিলেম খুলে।
তেমনি আবার বালকদিনের মতো
চোখ মেলে মোর সুদূর পানে বিনা কাজে প্রহর হোলো গত।
প্রখর তাপের কাল,
ঝরঝরিয়ে কেঁপে ওঠে শিরীষগাছের ডাল;
কুয়োর ধারে তেঁতুলতলায় ঢুকে
পাড়ার কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে ভিজে মাটির স্নিগ্ধ পরশ সুখে;
গাড়ির গোরু ক্ষণকালের মুক্তি পেয়ে ক্লান্ত আছে শুয়ে
জামের ছায়ায় তৃণবিহীন ভুঁয়ে।
কাঁকর পথের পারে
শুক্‌নো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে।
চেয়ে আছি দু চোখ দিয়ে সব কিছুরে ছুঁয়ে,
ভাবনা আমার সবার মাঝে থুয়ে।
বালক যেমন নগ্ন আবরণ,
তেমনি আমার মন
ঐ কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে।
সকল জানার মাঝে
চিরকালের না-জানা কার শঙ্খধ্বনি বাজে।
এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা
সেই আমারে করেছে আন্‌-মনা॥

২১ বৈশাখ, ১৩৩৮

বর্ষ-শেষ

যাত্রা হয়ে আসে সারা,—আয়ুর পশ্চিম পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি'
ছড়ায় ঐশ্বর্য্য তার ভরি দুই মুঠি।
বর্ণ-সমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা।
এই শেষ কথা নিয়ে নিঃশ্বাস আমার যাবে থামি,
—কত ভালোবেসেছিনু আমি।
অনন্ত রহস্য তারি উচ্ছলি' আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে দিল করি একাকার;
বেদনার পাত্র মোর বারম্বার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব্ব অমৃতে॥

দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী।
কতদিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইসারা।
নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জানিয়াছি তারে॥
আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে-লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে,
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব্ব অঙ্গে মনে।

যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে ॥

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্ব্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার ॥

লভিয়াছি জীবলোকে মানব-জন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি'
জানি তাহা সকলের বলি' ॥

ধূলির আসনে বসি' ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা ॥

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধ-মুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে ॥

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্ব্বাদ ;
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে॥
আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন,
মৃত্যু, তুমি ঘুচাও গুণ্ঠন।
কত কী গিয়েছে ঝরে, জানি জানি কত স্নেহ প্রীতি
নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি।
মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
ওগো শেষ, অশেষের ধনে॥

৩০শে চৈত্র, ১৩৩৩

মুক্তি

(১)

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণ-পতন-পীড়া হতে,
দিয়োনা দুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্ত্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপ-বেগে। শ্রাবণ-সন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে।—

নির্ম্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্ত্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণ শয্যাপরে,
পূর্ণতার মূর্ত্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে ; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
আপনার সুন্দর সীমায় ;—দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক্ শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা ॥

১৬ আষাঢ়, ১৩৩৪

(২)

আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি,
হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
তোমার আহ্বান-বাণী। আজ তব বাজুক বাঁশরী,
চিত্তভরা শ্রাবণ-প্লাবনরাগে,—যেন গো পাসরি
নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুব্ধ কোলাহল,
ধূলির নিবিড় টান পদতলে। রয়েছি নিশ্চল
সারাদিন পথপার্শ্বে , বেলা হয়ে এল অবসান,
ঘন হয়ে আসে ছায়া, শ্রান্ত সূর্য্য করিছে সন্ধান
দিগন্তে অন্তিম শান্তি। দিবা যথা চলেছে নির্ভীক
চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক
আপনার কাছ হতে অন্তহীন অজানার পানে
অসীমের সঙ্গীতে উদাসী,—সেই মতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হোক্ সুর,
নিয়ে যাক্ পথে পথে, হে অলক্ষ্য, হে মহাসুদূর ॥

১৭ আষাঢ়, ১৩৩৪

আহ্বান

আমার তরে পথের পরে কোথায় তুমি থাকো
সে কথা আমি শুধাই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখো
আমার লাগি নিভৃতে একধারে।
বাতাস বেয়ে ইসারা পেয়ে গেছি মিলন আশে
শিশির-ধোওয়া আলোতে ছোঁওয়া শিউলি-ছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলী-কল ভাষে
অধীরধারা নদীর পারে পারে।
আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে, সেথায় সারা বেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে॥
কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাকো,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরী।
সরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলিনাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেই খানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।

পাষাণ ভিৎ টলিছে যেথা ক্ষিতিব বুক ফাটি
ধূলায় চাপা অনলশিখা কাঁপায়ে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি,
সেথায় ভেরী বাজাও বারে বারে ॥

আম্বোয়াজ জাহাজ
সিঙাপুর বন্দর
৪ শ্রাবণ, ১৩৩৪

দুয়ার

হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।
অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই
প্রবেশিতে সংশয় সদাই ॥
হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রি দিনমান
সুগম্ভীব তোমার আহ্বান।
সূর্য্যের উদয়মাঝে খোলো আপনারে
তারকায় খোলো অন্ধকারে ॥
হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
খোলো পথ, ফুল হ'তে ফলে।
যুগ হতে যুগান্তর করো অবারিত,
মৃত্যু হতে পরম অমৃত ॥
হে দুয়ার, জীবলোক, তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তি-সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
"মাভৈঃ" বাজে নৈরাশ্য-নিশীথে ॥

১৩৩৪

দীপিকা

প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়,
জ্বালো তব নব দীপিকা।
প্রত্যুষ পটে প্রতিদিন লেখো
আলোকেব নব লিপিকা।
অন্ধকারেব সাথে দুর্ব্বার
সংগ্রাম তব হয় বাববাব,
দিনে দিনে হয় কত পবাজয়,
দিনে দিনে জয়-সাধনা।
পথ ভুলে ভুলে পথ খুঁজে লও,
সেই উৎসাহে পথ-দুখ বও,
দেব-বিদ্রোহে বাঁধা পড়ো মোহে
তবে হয় দেবাবাধনা॥

খেলাঘব ভেঙে বাঁধো খেলাঘর,
খেলো ভেঙে ভেঙে খেলেনা।
বাসা বেঁধে বেঁধে বাসা ভাঙে মন
কোথাও আসন মেলেনা।
জানি পথ-শেষে আছে পারাবার,
প্রতি খনে সেথা মেশে বারিধার,
নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে
ছুটিছে পথিক তটিনী।

ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান,
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণ-নটিনী ॥

২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৩

লেখা

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি? হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হোক্ লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক্ জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগ-বিজয়ার দিনে পূজার্চ্চনা সাঙ্গ হলে পরে
যায় প্রতিমার দিন। ধূলা তারে ডাক দিয়ে কয়,—
"ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা॥"

১১ চৈত্র, ১৩৩৩

নূতন শ্রোতা

১

শেষ লেখাটার খাতা
পড়ে শোনাই পাতার পরে পাতা,
অমিয়নাথ স্তব্ধ হয়ে দোলায় মুগ্ধ মাথা।
উচ্ছ্বসি কয়, তোমার অমর কাব্যখানি
নিত্যকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণী॥
দড়ি-বাঁধা কাঠের গাড়িটারে
নন্দগোপাল ঘটর ঘটর টেনে বেড়ায় সভাঘরের দ্বারে।
আমি বলি, "থাম্ রে বাপু থাম্,
দুষ্টুমি এর নাম,—
পড়ার সময় কেউ কি অমন বেড়ায় গাড়ি ঠেলে?
দেখ্ দেখি তোর অমি-কাকা কেমন লক্ষ্মী ছেলে!"
অনেক কষ্টে ভালোমানুষ বেশে
বস্‌ল নন্দ অমি-কাকার কোলের কাছে ঘেঁষে।
দুরন্ত সেই ছেলে
আমার মুখে ডাগর নয়ন মেলে
চুপ করে রয় মিনিট কয়েক, অমিরে কয় ঠেলে,
"শোনো অমি-কাকা,
গাড়ির ভাঙা চাকা
সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এঁটে ইস্ক্রুপ্!"
অমি বল্‌লে কানে কানে, "চুপ্ চুপ্ চুপ্!"
আবার খানিক শান্ত হয়ে শুন্‌ল বসে নন্দ
কবিবরের অমর ভাষার ছন্দ॥

একটু পরে উস্‌খুসিয়ে গাড়ির থেকে দশবারোটা কড়ি
মেজের পরে করলে ছড়াছড়ি।
ঝম্‌ঝমিয়ে কড়িগুলো গুন্‌গুনিয়ে আউড়ে চলে ছড়া,—
এর পরে আর হয়না কাব্য পড়া।
তার ছড়া আর আমার ছড়ায় আর কতখন চল্‌বে রেশারেশি,
হার মানতে হবেই শেষাশেষি॥

অমি বল্‌লে, "দুষ্টু ছেলে!" নন্দ বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে আড়ি,—
নিয়ে যাব গাড়ি,
দিন্‌দাদাকে ডাকব ছাতে ইষ্টিশনের খেলায়,
গড়গড়িয়ে যাবে গাড়ি বদ্দিবাটির মেলায়।"
এই বলে সে ছল্‌ছলানি চোখে
গাড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল কোন্ দিকে কোন্ ঝোঁকে॥

আমি বল্‌লেম, "যাও অমিয়, আজকে পড়া থাক্,—
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক।
আমার ছন্দে কান দিলনা ওযে
কী মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে।
যে-কবির ও শুন্‌বে পড়া সেও তো আজ খেলার গাড়ি ঠেলে,
ইষ্টিশনের খেলাই সেও খেলে।
আমার মেলা ভাঙবে যখন দেবো খেয়ায় পাড়ি,
তার মেলাতে পৌঁছবে তার গাড়ি।
আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশীটিরে নতুন প্রাণের গীতে।
ভরে ছিলেম এই-ফাগুনের ডালা
তা নিয়ে কেউ নাই বা গাঁথুক আর-ফাগুনের মালা॥"

২

বছর বিশেক চলে গেল সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা ;
নন্দ বল্‌লে, "দাদামশায়, কী লিখেছ শোনাও তো এই বেলা।"
পড়তে গেলেম ভর্‌সাতে বুক বেঁধে,
কণ্ঠ যে যায় বেধে ;
টেনে টেনে বাহির করি এ খাতা ঐ খাতা,
উল্টে মরি এ পাতা ঐ পাতা।
ভয়ের চোখে যতই দেখি লেখা,
মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা।
গোপনে তার মুখের পানে চাহি,
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
নতুনকালের শান-দেওয়া তার ললাটখানি খর খড়্গসম
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্ম্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।
সংসারেতে গর্ত্তগুহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।
তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য॥
একটু কেশে পড়া করলেম সুরু—
যৌবনে যা শিখিয়েছিলেন অন্তর্যামী আমার কবিগুরু,—
প্রথম প্রেমের কথা,
আপ্‌নাকে সেই জানে না যেই গভীর ব্যাকুলতা,
সেই যে বিধুর তীব্রমধুর তরাস-দোদুল বক্ষ দুরু দুরু,—
উড়ো পাখীর ডানার মতো যুগল কালো ভুরু ;

নীরব চোখের ভাষা,
এক নিমেষে উচ্ছলি দেয় চিরদিনের আশা,
তাহারি সেই দ্বিধার ঘায়ে ব্যথায় কম্পমান
ছুটি একটি গান।
এড়িয়ে চলা জলধারার হাস্যমুখর কলকলোচ্ছ্বাস,
পূজায় স্তব্ধ শরৎপ্রাতের প্রশান্ত নিঃশ্বাস,
বৈরাগিণী ধূসর সন্ধ্যা অস্তসাগর পারে,
তন্দ্রাবিহীন চিরন্তনের শান্তিবাণী নিশীথ অন্ধকারে,—
ফাগুন রাতির স্পর্শ-মায়ায় অরণ্যতল পুষ্প-রোমাঞ্চিত,
কোন্ অদৃশ্য সুচির-বাঞ্ছিত
বনবীথির ছায়াটিরে
কাঁপিয়ে দিয়ে বেড়ায় ফিরে ফিরে,
তারি চঞ্চলতা
মর্ম্মরিয়া কইল যে সব কথা,
তারি প্রতিধ্বনিভরা
দুএকটা চৌপদী আমার সসঙ্কোচে পড়ে গেলেম ত্বরা॥
পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বল্‌ল হঠাৎ ঝেঁকে—
"দাদামশায়, সাবাস্!
তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস।"
খাতা নিতে হাত বাড়ালো, চাদরেতে দিলেম তাহা ঢাকা,
কইনু তারে, "দেখ্‌তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয় কাকা।"

আবা-মারু জাহাজ,
২৭শে অক্টোবর,
গঙ্গা

আশীর্ব্বাদ

(তরুণ আশীর্ব্বাদপ্রার্থীর প্রতি প্রাচীন কবির নিবেদন)

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে—

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে।
ঊর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধু সনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল "আশীর্ব্বাদ মাগি,
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশীষ তোমারি তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাত সূর্য্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বীর
বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্ব্বাদনীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায়া হতে,
নির্জ্জনে একান্তে বসি, দেখি নির্বারিত স্রোতে
সঙ্গীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ, পথরোধী পাষাণ সঞ্চয়,
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনার জাগায় উৎসাহ।"

১২ পৌষ,
১৩৩৫

মোহানা

ইরাবতীর মোহানা-মুখে কেন আপন-ভোলা
সাগর তব বরণ কেন ঘোলা ?
কোথা সে তব বিমল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া,
রবির পানে গভীর গান গাওয়া ?
নদীর জলে ধরণী তার পাঠালে এ কী চিঠি,
কিসের ঘোরে আবিল হোলো দিঠি ?
আকাশ সাথে মিলায়ে রঙ আছিলে তুমি সাজি,
ধরার রঙে বিলাস কেন আজি ?
রাতের তারা আলোকে আজ পরশ করে যবে
পায় না সাড়া তোমার অনুভবে ;
প্রভাত চাহে স্বচ্ছ জলে নিজেরে দেখিবারে,
বিফল করি ফিরায়ে দাও তারে ॥
নিয়েছ তুমি ইচ্ছা করি আপন পরাজয়,
মানিতে হার নাহি তোমার ভয়।
বরণ তব ধূসর করো, বাঁধন নিয়ে খেলো,
হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেলো।
এ লীলা তব প্রান্তে শুধু তটের সাথে মেশা,
একটুখানি মাটির লাগে নেশা।
বিপুল তব বক্ষপরে অসীম নীলাকাশ,
কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ ?

ধূলারে তুমি নিয়েছ মানি, তবুও অমলিন,
বাঁধন পরি স্বাধীন চিরদিন।
কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তাঁরে কালো কলুষ জাল॥

ইরাবতী সঙ্গম, বঙ্গসাগর
৭ কার্ত্তিক, ১৩৩৪

বক্‌সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্দ্ধস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত্য নরের রাজধানী॥
"অমৃতের পুত্র মোরা"—কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জ্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

দার্জ্জিলিং
১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

দুর্দ্দিনে

দুর্য্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি
কর্ম্মে জড়ায় গ্রন্থি,
মন্থর দিন পাথেয়-বিহীন-
দীর্ঘ পথের পন্থী ;
নির্দ্দয়তম নিন্দার হাস,
নির্ম্মমতম দৈব,
শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস
ফুকারে "নৈব নৈব ;"
হঠাৎ তখন কহে মোরে মন,
"মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয়
সুর যদি রয় চিত্তে ৷৷"

চৌদিক করে যুদ্ধ ঘোষণ,
দুর্গম হয় পন্থা,
চিন্তায় করে রক্ত শোষণ
প্রখর নখর-দন্তা,
নিরানন্দের ঘিরি রহে ঘের,
নাই জীবনের সঙ্গী,
দৈন্য কুরূপ করে বিদ্রূপ
ব্যঙ্গের মুখভঙ্গী,
মন বলে, "নাই ভাবনা কিছুই
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
অন্তর মাঝে চিরধনী তুই
অন্তবিহীন বিত্তে ৷৷"

ভাষাহীন দিন কুয়াষাবিলীন।
মলিন উষার স্বর্ণ,
কল্পনা যত বাছুড়ের মতো
রাতে ওড়ে কালো বর্ণ ;
আবর্জ্জনার অচল পুঞ্জে
যাত্রার পথ রুদ্ধ,
রিক্ত-কুসুম শুষ্ক কুঞ্জে
বৈশাখ রহে ক্রুদ্ধ,
মন মোরে কয়, "এ কিছুই নয়,
মিথ্যে এ সব মিথ্যে,
আপনায় ভুলে গাও প্রাণ খুলে,
নাচো নিখিলের নৃত্যে ॥"

বন্ধ-দুয়ার বিশ্ব বিরাজে,
নিবেছে ঘরের দীপ্তি,
চির-উপবাসী আপনার মাঝে
আপনি না পাই তৃপ্তি,
পদে পদে রয় সংশয় ভয়,
পদে পদে প্রেম ক্ষুণ্ণ,
বৃথা আহ্বান, বৃথা অনুনয়,
সখার আসন শূন্য,
মন বলি উঠে, "ডুবে যা গভীরে,
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
নিবিড় ধেয়ানে নিখিল লভি রে
আপনারি একাকিত্বে।"

আবা মারু, বঙ্গসাগর
৯ কার্ত্তিক, ১৩৩৪

প্রশ্ন

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।—
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো॥

পৌষ, ১৩৩৮

ভিক্ষু

হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর,
নিঃশেষে দে বিদায় রে।
ভিক্ষাতে শুভলগ্নের ক্ষয়
কোন্ ভুলে তুই ভুলিলি,
ভাণ্ডার তোর পণ্ড যে হয়,
অর্গল নাহি খুলিলি।
আপনাবে নিয়ে আবরণ দিয়ে
এ কী কুৎসিত ছলনা ;
জীর্ণ এ চীর ছদ্মবেশীর,
নিজেরে সে কথা বল না।
হায় রে, ভিক্ষু, হায় বে,
মিথ্যা মায়ার ছায়া ঘুচাবার
মন্ত্র কে নিবি আয় রে॥
কাঙাল যে-জন পায় না সে ধন,
পায় সে কেবল ভিক্ষা।
চির-উপবাসী মিছে সন্ন্যাসী
দিয়েছে তাহারে দীক্ষা।
তোর সাধনায় রত্ন-মাণিক
পথে পথে যাস্ ছড়ায়ে,

ভিক্ষার ঝুলি, ধিক্ তারে ধিক্,
বহিস্‌নে শিরে চড়ায়ে।
হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বজনের ত্বঃস্বপনের
বন্ধ, ছিঁড়িস্ তায় রে॥

অঞ্চলে রাতি ভিক্ষার কণা
সঞ্চয় করে তারাতে,
নিয়ে সে পাষাণী তবু পারিল না
তিমির-সিন্ধু পারাতে।
পূর্ব্ব গগন আপনার সোনা
ছড়ালো যখন দ্যুলোকে
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা,
প্রভাত পূরিল পুলকে।
হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে,
আপনা মাঝারে গোপন রাজারে
মন যেন তোর পায় রে॥

বাঙ্গালোর
৯ আষাঢ়, ১৩৩৬

আশীর্ব্বাদী

[কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে]

তোমারে জননী ধরা
দিল রূপে রসে ভরা
প্রাণের প্রথম পাত্রখানি,

তাই নিয়ে তোলাপাড়া,
ফেলাছড়া নাড়াচাড়া,
অর্থ তার কিছুই না জানি।
কোন্ মহা রঙ্গশালে
নৃত্য চলে তালে তালে,
ছন্দ তারি লাগে রক্তে তব।
অকারণ কলরোলে
তাই তব অঙ্গ দোলে,
ভঙ্গী তার নিত্য নব নব।
চিন্তা-আবরণহীন
নগ্নচিত্ত সারাদিন
লুটাইছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে।
ভাষাহীন ইসারায়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
যাহা কিছু দেখে আর শোনে।
অস্ফুট ভাবনা যত
অশথ পাতার মতো
কেবলি আলোয় ঝিলিমিলি।
কী হাসি বাতাসে ভেসে
তোমারে লাগিছে এসে
হাসি বেজে ওঠে খিলিখিলি।
গ্রহ তারা শশি রবি
সমুখে ধরেছে ছবি
আপন বিপুল পরিচয়।
কচি কচি তুই হাতে
খেলিছ তাহারি সাথে,
নাই প্রশ্ন, নাই কোনো ভয়।

তুমি সর্ব্ব দেহে মনে
ভরি লহ প্রতিক্ষণে
যে সহজ আনন্দের রস,
যাহা তুমি অনায়াসে
ছড়াইছ চারি পাশে
পুলকিত দরশ পরশ,
আমি কবি তারি লাগি
আপনার মনে জাগি,
বসে থাকি জানালার ধারে।
অমরার দূতীগুলি
অলক্ষ্য দুয়ার খুলি
আসে যায় আকাশের পারে।
দিগন্তে নীলিম ছায়া
রচে দূরান্তের কায়া
বাজে সেথা কী অশ্রুত বেণু।
মধ্যদিন তন্দ্রাতুর
শুনিছে রৌদ্রের সুর,
মাঠে শুয়ে আছে ক্লান্ত ধেনু।
চোখের দেখাটি দিয়ে
দেহ মোর পায় কী এ,
মন মোর বোবা হয়ে থাকে।
সব আছে আমি আছি
এই দুইয়ে কাছাকাছি
আমার সকল-কিছু ঢাকে।
যে-আশ্বাসে মর্ত্ত্যভূমি
হে শিশু, জাগাও তুমি,
যে নির্ম্মল যে সহজ প্রাণে,

কবির জীবনে তাই
যেন বাজাইয়া যাই
তারি বাণী মোর যত গানে।
ক্লান্তিহীন নব আশা
সেই তো শিশুর ভাষা,
সেই ভাষা প্রাণ-দেবতার,
জরার জড়ত্ব ত্যেজে
নব নব জন্মে সে যে
নব প্রাণ পায় বারম্বার।
নৈরাশ্যের কুহেলিকা
উষার আলোক টিকা
ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়,
বাধার পশ্চাতে কবি
দেখে চিরন্তন রবি
সেই দেখা শিশু-চক্ষে ভায়।
শিশুর সম্পদ বয়ে
এসেছ এ লোকালয়ে
সে সম্পদ থাক্ অমলিনা।
যে বিশ্বাস দ্বিধাহীন
তারি সুরে চিরদিন
বাজে যেন জীবনের বীণা॥

দার্জ্জিলিং
৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

অবুঝ মন

অবুঝ শিশুর আব্ছায়া এই নয়ন-বাতায়নের ধারে
আপ্না-ভোলা মনখানি তার অধীর হয়ে উঁকি মারে।
বিনা-ভাষার ভাবনা নিয়ে কেমন আঁকু-বাঁকুর খেলা,—
হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছড়িয়ে ফেলা,
হঠাৎ অকারণ
কী উৎসাহে বাহু নেড়ে উদ্দাম গর্জ্জন।
হঠাৎ দুলে দুলে ওঠে,
অর্থবিহীন কোন্ দিকে তার লক্ষ্য ছোটে।
বাহির ভুবন হোতে
আলোর লীলায় ধ্বনির স্রোতে
যে বাণী তার আসে প্রাণে
তারি জবাব দিতে গিয়ে কী যে জানায় কেই তা জানে॥
এই যে অবুঝ এই যে বোবা মন
প্রাণের পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে যে অধীর অনুক্ষণ;
সর্ব্ব দিকেই সর্ব্বদা উন্মুখ,
আপ্নারি চাঞ্চল্য নিয়ে আপ্নি সমুৎসুক,—
নয় বিধাতার নবীন রচনা এ,
ইহার যাত্রা আদিম যুগের নায়ে।
বিশ্বকবির মানস সরোবরে
প্রাতঃস্নানের পরে
প্রাণের সঙ্গে বাহির হোলো, তখন অন্ধকার,
নিয়ে এলো ক্ষীণ আলোটি তার।

তারি প্রথম ভাষাবিহীন কূজন কাকলী যে
বনে বনে শাখায় পাতায় পুষ্পে ফলে বীজে
অঙ্কুরে অঙ্কুরে
উঠল জেগে ছন্দে সুরে সুরে।
সূর্য্য পানে অবাক্ আঁখি মেলি
মুখরিত উচ্ছল তার কেলি॥
নানারূপের খেলনা যে তার নানা বর্ণে আঁকে,
বারেক খোলে, বারেক তারে ঢাকে।
রোদ-বাদলে করুণ কান্না হাসি
সদাই ওঠে আভাসি উচ্ছ্বাসি॥
ঐ যে শিশুর অবুঝ ভোলা মন
তরীর কোণে বসে বসে দেখ্ছি তারি আকুল আন্দোলন।
মাঝে মাঝে সাগর পানে তাকিয়ে দেখি যত
মনে ভাবি ও যেন এই শিশু-আঁখির মতো,
আকাশ পানে আব্ছায়া ওর চাওয়া
কোন্ স্বপনে-পাওয়া,
অন্তরে ওর যেন সে কোন্ অবুঝ ভোলা মন
এ-তীর হতে ও-তীর পানে দুল্ছে অনুক্ষণ।
কেমন কল ভাষে
প্রলয় কাঁদন কাঁদে ও যে প্রবল হাসি হাসে
আপ্নিও তার অর্থ আছে ভুলে,—
ক্ষণে ক্ষণে শুধুই ফুলে ফুলে
অকারণে গর্জ্জি উঠে শূন্যে শূন্যে মূঢ় বাহু তুলে॥
বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্নারে তার অধীর অন্বেষণ।

ঘর হতে ধায় আঙন পানে, আঙন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্ন-বিষম অরণ্যে পর্ব্বতে ;
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
পায়ের তলার ধরণীরে আঘাত করে ধূলায় আকাশ ব্যেপে ;
হঠাৎ ক্ষেপে উঠে
রুদ্ধ পাষাণভিত্তি পরে বেড়ায় মাথা কুটে।
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপন-গড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠা-পড়া।
হঠাৎ উঠে ঝেঁকে
যায় সে ছুটে কী রাঙা রং দেখে
অদৃশ্য কোন্ দূর দিগন্ত পানে ;
আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,
তাহার ব্যাকুলতা
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা॥

আবা-মারু জাহাজ
৩রা কার্ত্তিক, ১৩৩৪

পরিণয়

(সুষমা ও সুরেন্দ্রনাথ করের বিবাহ উপলক্ষ্যে)

ছিল চিত্র-কল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে,
সেই অপরূপ এল রূপ ধরি তোমাদের প্রাণে।
আনন্দের দিব্যমূর্ত্তি সে যে,
দীপ্ত বীর তেজে

উত্তরিয়া বিঘ্ন যত দূর করি ভীতি
তোমাদের প্রাঙ্গণেতে হাঁক দিল, "এসেছি অতিথি" ॥
জ্বালো গো মঙ্গলদীপ, করো অর্ঘ্যদান,
তব মনপ্রাণ।
ও যে সুর-ভবনের, রমার কমলবনবাসী,
মর্ত্ত্যে নেমে বাজাইল সাহানায় নন্দনের বাঁশি।
ধরার ধূলির পরে
মিশাইল কী আদরে
পারিজাত রেণু।
মানবগৃহের দৈন্যে অমরাবতীর কল্পধেনু
অলক্ষ্য অমৃত রস দান করে
অন্তরে অন্তরে।
এল প্রেম চিরন্তন, দিল দোঁহে আনি
রবিকর-দীপ্ত আশীর্ব্বাণী ॥

২৫ বৈশাখ, ১৩৩৮

চিরন্তন

এই বিদেশেব রাস্তা দিয়ে ধূলোয় আকাশ ঢেকে
গাড়ি আমার চল্‌তেছিল হেঁকে।
হেন কালে নেবুর ডালে স্নিগ্ধ ছায়ায় উঠ্‌ল কোকিল ডেকে
পথ-কোণের ঘন বনের থেকে ॥

এই পাখীটির স্বরে
চিরদিনের সুর যেন এই একটি দিনের পরে
বিন্দু বিন্দু ঝরে।
ছেলেবেলায় গঙ্গাতীরে আপন মনে চেয়ে জলের পানে
শুনেছিলেম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীমকালের অনির্ব্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল—"তুমি আমার প্রিয়॥"
সেই ধ্বনিটির কানন ব্যেপে পল্লবে পল্লবে
জলের কলরবে
ওপার পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে।
আজ এই পরবাসে
সেই ধ্বনিটি ক্ষুব্ধ পথের পাশে
গোপন শাখার ফুলগুলিরে দিল আপন বাণী।
বনচ্ছায়ার শীতল শান্তিখানি
প্রভাত আলোর সঙ্গে করে নিবিড় কানাকানি
ঐ বাণীটির বিমল সুরে গভীর রমণীয়
"তুমি আমার প্রিয়।"
এরি পাশেই নিত্য হানাহানি;
প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি
সরল বিশ্বাস;
কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্ব্বনাশ।
নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি পৃথ্বীব্যাপী মানব বিভীষিকা
জ্বালায় মানব-লোকালয়ে প্রলয়-বহ্নি শিখা,
লোভের জালে বিশ্বজগৎ ঘেরে,
ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপন-হানা অন্ধ মানুষেরে।

হেনকালে স্নিগ্ধ ছায়ায় হঠাৎ কোকিল ডাকে
ফুল্ল অশোকশাখে ;
পরশ করে প্রাণে
যে শান্তিটি সব প্রথমে, যে শান্তিটি সবার অবসানে,
যে শান্তিতে জানায় আমায় অসীম কালের অনির্ব্বচনীয়,
"তুমি আমার প্রিয়।"

পিনাঙ
১ কার্ত্তিক, ১৩৩৪

কণ্টিকারী

শিলঙে এক গিরির খোপে পাথর আছে খসে,
তারি উপর লুকিয়ে বসে
রোজ সকালে গেঁথেছিলেম ভোরের সুরে গানের মালা।
প্রথম সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে ছিল আমার মুখোমুখির পালা।
ডানদিকেতে অফলা এক পিচের শাখা ভরে
ফুল ফোটে আর ফুল পড়ে যায় ঝরে।
কালো ডানায় হল্‌দে আভাস কোন্ পাখী সেই অকারণের গানে
ক্লান্তি নাহি জানে,—
তেমনিতরো গোলাপলতা লতাবিতান ঢেকে
অজস্র তার ফুলের ভাষায় অন্ত না পায় উদ্দেশহীন ডেকে।
পাইন বনের প্রাচীন তরু তাকায় মেঘের মুখে,
ডালগুলি তার সবুজ ঝর্ণা ধরার পানে ঝুঁকে

মন্ত্রে যেন থমক লেগে আছে।
দুটি দালিম গাছে
ঘন সবুজ পাতার কোলে কোলে
ঘন রাঙা ফুলের গুচ্ছ দোলে।
পায়ের কাছে একটি কন্টিকারী—
অন্তরঙ্গ কাছের সঙ্গ তারি,
দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহি করে।
মাটির কাছে নত হলে পরে
স্নিগ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধূলিশয়ন থেকে
নীলবরণের ফুলের বুকে একটুখানি সোনাব বিন্দু এঁকে॥
সেদিন যত রচেছিলাম গান
কন্টিকারীর দান
তাদের সুরে স্বীকার করা আছে।
আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষণিক শান্তি যাচে
দুঃখ দিনের দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে—
হঠাৎ কেন জাগ্‌ল আমার মনে—
সেই সকালের টুক্‌রো একটুখানি—
মাটির কাছে কন্টিকারীর নীল সোনালির বাণী॥

৫ আষাঢ়, ১৩৩৯

আরেক দিন

স্পষ্ট মনে জাগে,
তিরিশ বছর আগে
তখন আমার বয়স পঁচিশ ;—কিছুকালের তরে
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে।
সূর্য্য যখন নেমে যেত নীচে
দিনের শেষে ঐ পাহাড়ে পাইন্ শাখার পিছে,
নীল শিখরের আগায় মেঘে মেঘে
আগুন বরণ কিরণ রইত লেগে,—
দীর্ঘ ছায়া বনে বনে এলিয়ে যেত পর্ব্বতে পর্ব্বতে ;—
সাম্‌নেতে ঐ কাঁকর-ঢালা পথে
দিনের পরে দিনে
ডাক-পিয়নেব পায়ের ধ্বনি নিত্য নিতেম চিনে।
মাসের পরে মাস গিয়েছে, তবু
একবারো তার হয়নি কামাই কভু ॥
আজো তেমনি সূর্য্য ডোবে সেই খানেতেই এসে
পাইন বনের শেষে ;
সুদূর শৈলতলে
সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝর্‌নাধারার জলে,
সেই সেকালের মতোই তেম্‌নি ধারা
তারার পরে তারা
আলোর মন্ত্র চুপি চুপি শুনায় কানে পর্ব্বতে পর্ব্বতে,
শুধু আমার কাঁকর-ঢালা পথে

বহুকালের চেনা
ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনো বাজ্‌বে না॥
আজকে তবু কী প্রত্যাশা জাগ্‌ল আমার মনে,—
চল্‌তে চল্‌তে গেলেম অকারণে
ডাকঘরে সেই মাইল তিনেক দূরে।
দ্বিধা ভরে মিনিট কুড়িক এদিক ওদিক ঘুরে
ডাকবাবুদের কাছে
শুধাই এসে, "আমার নামে চিঠিপত্তর আছে?"
জবাব পেলেম "কই, কিছুতো নেই।"
শুনে তখন নতশিরে আপন মনেতেই
অন্ধকারে ধীরে ধীরে
আসছি যখন শূন্য আমার ঘরের দিকে ফিরে,
শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বল্‌লে হঠাৎ কোন্ পথিকে
"মাথা খেয়ো, কাল কোরোনা দেরী।"
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশ বছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ঐ পাহাড়ের দূরে
কাঁকর-ঢালা পথের পরে ডাক-পিয়নের পদধ্বনির সুরে॥

রফিউস্ জাহাজ
৬ ভাদ্র, ১৩৩৪

তে হি নো দিবসাঃ

এই অজানা সাগরজলে বিকেল বেলার আলো
লাগল আমার ভালো।
কেউ দেখে কেউ নাই বা দেখে, রাখ্‌বে না কেউ মনে,
এমনতর ফেলা-ছড়ার হিসাব কি কেউ গোণে ?
এই দেখে মোর ভর্‌ল বুকের কোণ ;
কোথা থেকে নামল রে সেই ক্ষ্যাপা দিনের মন,
যেদিন অকারণ
হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরি ঢেউ
ছল্‌ছলিয়ে উঠ্‌ত প্রাণে জান্‌ত না তা কেউ।
লাগ্‌ত আমায় আপন গানের নেশা
অনাগত ফাগুন দিনের বেদন দিয়ে মেশা।
সে গান যারা শুন্‌ত তারা আড়াল থেকে এসে
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে।
হয়তো তাদের দেবার ছিল কিছু,
আভাসে কেউ জানায় নি তা নয়ন করে নীচু।
হয়তো তাদের সারা দিনের মাঝে
পড়ত বাধা এক বেলাকার কাজে।
চমক-লাগা নিমেষগুলি সেই
হয়তো বা কার মনে আছে, হয়তো মনে নেই।
জ্যোৎস্না রাতে একলা ছাদের পরে
উদার অনাদরে
কাট্‌ত প্রহর লক্ষ্যবিহীন প্রাণে,
মূল্যবিহীন গানে।

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীণ,—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে
রূপ-হারানো রাধা-শ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে ;
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেল বেলা,
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলো-ছায়ার ভেলা॥

মারুর জাহাজ
১৫ আশ্বিন, ১৩৩৪

দীপশিল্পী

হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী,
তোমার অরূপ জ্যোতি
রূপ লবে আমার জীবনে,
তারি লাগি একমনে
রচিলাম এই দীপখানি,
মূর্তিমতী এই মোর অভ্যর্থনাবাণী॥
এসো এসো করো অধিষ্ঠান
মোর দীর্ঘ জীবনেরে করো গো চরম বরদান।
হয় নাই যোগ্য তব,
কতবার ভাঙিয়াছি আবার গড়েছি অভিনব,—
মোর শক্তি আপনারে দিয়েছে ধিক্কার।
সময় নাহি যে আর,

নিদ্রাহারা প্রহর যে একে একে হয় অপগত,
তাই আজ সমাপিনু ব্রত।
গ্রহণ করো এ মোর চিরজীবনের রচনারে
ক্ষণকাল স্পর্শ করো তারে।
তারপরে রেখে যাব এ জন্মের এক-সার্থকতা,
চিরন্তন সুখ মোর, এই মোর নিরন্তব ব্যথা॥

ফাল্গুন, ১৩৩৮

মানী

উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমাব
ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতাব মতো
সম্মান-শৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসন তলে।
সাধারণ-জন-পরশ এড়ায়ে
নিজেরে পৃথক করি
আছ দিনরাত গৌরব-গুরু
কঠিন মূর্ত্তি ধরি।

সবার যেখানে ঠাঁই
বিপুল তোমার মর্য্যাদা নিয়ে
সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব,
মানুষ উপাধি হারায়েছ শুধু
সে ক্ষতি কাহারে কব॥
ভক্তেরা মন্দিরে
পূজারীর কৃপা বহুদামে কিনে
পূজা দিয়ে যায় ফিরে
ঝিল্লীমুখর বেণুবীথিকার ছায়ে
আপন নিভৃত গাঁয়ে।
তখন একাকী বৃথা বিচিত্র
পাষাণ-ভিত্তি মাঝে
দেবতার বুকে জানো সে কী ব্যথা বাজে।
বেদীর বাঁধন করি ধূলিসাৎ
অচলেরে দিয়ে নাড়া
মানুষের মাঝে সে যে পেতে চায় ছাড়া॥
হে রাজা, তোমার পূজা-ঘেরা মন
আপনারে নাহি জানে।
প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙ-করা তুমি ঢেলা,—
তোমার জীবন সাজানো পুতুল,
স্থূল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে
আপনার অভিশাপে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্ব্বের চাপে।

সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা
মুক্ত ভুবনে ফিরে
মরিবার আগে তাদের পরশ
লাগুক তোমার শিরে ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৮

রাজপুত্র

রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী
রাজপুত্র কোথা হতে আসি
শুভক্ষণে দেখা দেয় রূপে
চুপে চুপে,
জানি বলে জেনেছিনু যারে
তারি মাঝে। আমার সংসারে,
বক্ষে মোর আগমনী পদধ্বনি বাজে
যেন বহুদূর হতে আসা।
তার ভাষা
প্রাণে দেয় আনি
সমুদ্রপারের কোন্ অভিনব যৌবনের বাণী।
সেদিন বুঝিতে পারে মন
ছিল সে যে নিশ্চেতন
তুচ্ছতার অন্তরালে
এতকাল মায়ানিদ্রাজালে।

তার দৃষ্টিপাতে মোরে নূতন সৃষ্টির ছোঁওয়া লাগে,
চিত্ত জাগে।—
বলি তার পদযুগ চুমি,
"রাজপুত্র তুমি।"
এতদিন
আত্মপরিচয়হীন
জড়তার পাষাণ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গমাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।
কোন্ মন্ত্রগুণে
সে দুর্ভেদ বাধা যেন দাহিলে আগুনে,
বন্দিনীরে করিলে উদ্ধার,
করি নিলে আপনার,
নিয়ে গেলে মুক্তির আলোকে।
আজিকে তোমারে দেখি কী নূতন চোখে।
কুঁড়ি আজ উঠেছে কুসুমি,
বারবার মন বলে, "রাজপুত্র তুমি"॥

২৮ ফাল্গুন, ১৩৩৮

অগ্রদূত

হে পথিক, তুমি একা।
আপনার মনে জানি না কেমনে
অদেখার পেলে দেখা।
যে পথে পড়েনি পায়ের চিহ্ন
সে পথে চলিলে রাতে,

আকাশে দেখেছ কোন্ সঙ্কেত,
কারেও নিলে না সাথে।
তুঙ্গগিরির উঠিছ শিখরে
যেখানে ভোরের তারা
অসীম আলোকে করিছে আপন
আলোর যাত্রা সারা॥

প্রথম যেদিন ফাল্গুন তাপে
নব নির্ঝর জাগে,
মহা সুদূরের অপরূপ রূপ
দেখিতে সে পায় আগে।
আছে, আছে, আছে, এই বাণী তার
এক নিমেষেই ফুটে,
অচেনা পথের আহ্বান শুনে
অজানার পানে ছুটে।
সেই মতো এক অকথিত ভাষা
ধ্বনিল তোমার মাঝে,
আছে, আছে, আছে এ মহামন্ত্র
প্রতি নিঃশ্বাসে বাজে॥

রোধিয়াছে পথ বন্ধুর করি
অচল শিলার স্তূপ।
নহে, নহে, নহে, এ নিষেধ বাণী
পাষাণে ধরেছে রূপ।
জড়ের সে নীতি করে গর্জ্জন
ভীরু জন মরে ভুলে,
জনহীন পথে সংশয় মোহ
রহে তর্জ্জনী তুলে।

অলস মনের আপনারি ছায়া
শঙ্কিল কায়া ধরে,
অতি নিরাপদ বিনাশের তলে
বাঁচিতে চেয়ে সে মরে ॥

নব জীবনের সঙ্কট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনেব ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী, আছে আছে ॥

১২ চৈত্র, ১৩৩৮

প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমাব সুপ্তির প্রান্তে,
নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাত তারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল।

চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের পরে।
স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহর শেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্ব্বতট পানে,
প্রথম আলোকে
স্পর্শস্নান হবে তার এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।
তব নব জাগরণী প্রথম-যে হাসি
কনক চাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধো-খোলা অধরেতে, নয়নের কোণে,
চয়ন করিব তাই,
এই আছে মনে॥

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

নির্ব্বাক

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু
যে কথা আমি বলিনি আর কারে,
সেদিন বনে মাধবী-শাখা নীচু
ফুলের ভারে ভারে।

বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি
বিরহব্যথা-বৃন্ত হতে ভাঙা,—
গোপন রাতে উঠেছে তা'রা ফুলি
সুরেব রঙে রাঙা ॥
শিরীষ বন নতুন পাতা-ছাওয়া
মর্ম্মরিয়া কহিল, গাহো গাহো।
মধুমালতী-গন্ধে ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোযারে উছলিয়া
নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া
ঘাসের পরে লুটে ॥
সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে
কোথাও কিছু ছিল না কৃপণতা।
চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে
যত মনের কথা।
মনে হোলো যে নীরবে কৃপা যাচে
যা-কিছু আছে তোমার চারিদিকে।
সাহস ধরি গেলেম তব কাছে
চাহিনু অনিমিখে।
সহসা মন উঠিল চমকিযা
বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী।
গহনছায়ে দাঁড়ানু থমকিযা
হেরিনু মুখখানি ॥
সাগর-শেষে দেখেছি একদিন
মিলিছে সেথা বহুনদীর ধারা—

ফেনিল জল দিক্‌সীমায় লীন
অপারে দিশাহারা।
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
অবোধসম কাঁপিছে থরথরি,—
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে
বাঁধিব মোর তরী।
তেমনি আজি তোমার মুখে চাহি
নয়ন যেন কূল না পায় খুঁজি,
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি
তোমারে নাহি বুঝি।
মুখেতে তব শ্রান্ত এ কি আশা,
শান্তি এ কি গোপন এ কি প্রীতি,
বাণী-বিহীন এ কি ধ্যানের ভাষা
এ কি সুদূর স্মৃতি।
নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে
স্তব্ধ তব নীরব গভীরতা,—
রহিনু বসি লতা-বিতান-কোণে,
কহিনি কোনো কথা॥

মাঘ, ১৩৩৮

প্রণাম

তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ
যারে তুমি করেছ বরণ।
তুমি মূল্য দিলে তারে
দুর্লভ পূজার অলঙ্কারে।

ভক্তি-সমুজ্জ্বল চোখে
তাহারে হেরিলে তুমি যে-শুভ্র আলোকে
সে আলো করালো তারে স্নান ;
দীপ্যমান মহিমার দান
পরাইল ললাটের পর।
হোক সে দেবতা কিম্বা নর
তোমারি হৃদয় হতে বিচ্ছুরিত রশ্মির ছটায়
দিব্য আবির্ভাবে তার প্রকাশ ঘটায়।
তার পরিচয়খানি
তোমাতেই লভিয়াছে জয়বাণী।
রচিয়া দিয়াছে তার সত্য স্বর্গপুরী
তোমারি এ প্রীতির মাধুরী।
যে অমৃত করে পান
ঢালে তাহা তোমারি এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
তব শির নত
দিক্ রেখায় অরুণের মতো,—
তারি পরে দেবতার অভ্যুদয়
রূপ লভে সুপ্রসন্ন পুণ্য জ্যোতির্ম্ময়॥

১৭ চৈত্র ১৩৩৮

শূন্যঘর

গোধূলি-অন্ধকারে
পুরীর প্রান্তে অতিথি আসিনু দ্বারে।
ডাকিনু আছ কি কেহ,
সাড়া দেহো, সাড়া দেহো॥

ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা
না কহিল কোনো কথা।
বাহিরে বাগানে পুষ্পিত শাখা
গন্ধের আহ্বানে
সঙ্কেত করে কাহারে তাহা কে জানে।
হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি,
জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া
নীরবে দাঁড়ায়ে মালী।
সিঁড়িটা নির্ব্বিকার
বলে, "এসো আর নাই যদি এসো
সমান অর্থ তার।"
ঘরগুলো বলে ফিলজফারের গলায়,
"ডুব দিয়ে দেখো সত্তা-সাগর তলায়
বুঝিতে পারিবে, থাকা নাই থাকা,
আসা আর দূরে যাওয়া
সবই এক কথা, খেয়ালের ফাঁকা হাওয়া।
কেদারা এগিয়ে দিতে কারো নেই তাড়া,
প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া।
মেয়াদ যখন ফুরোয় কপালে,
হায়রে তখন, সেবা
কারেই বা করে কেবা।
মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁওয়া,
সকলি দেখিনু ধোঁওয়া।
ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
বুঝি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।

নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্ অতিশয়,
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।
অতএব—আরে, অতএবখানা থাক্,—
আপাতত ফেরা যাক্॥

ব্যর্থ আশায় ভাবাতুর সেই ক্ষণে
ফিরালেম রথ, ফিরিবার পথ
দূরতর হোলো মনে।
যাবার বেলায় শুষ্ক পথের
আকাশ-ভরানো ধূলি
সহজে ছিলাম ভুলি।
ফিরিবার বেলা মুখেতে রুমাল,
ধোঁয়াটে চষমা চোখে,
মনে হোলো যত মাইক্রোব-দল
নাকে মুখে সব ঢোকে।
তাই বুঝিলাম, সহজ তো নয়
ফিলজফারের বুদ্ধি।
দরকার করে বহুৎ চিত্ত-শুদ্ধি॥
মোটর চলিল জোরে,
একটু পরেই হাসিলাম হো হো করে।
সংশয়হীন আশার সাম্‌নে
হঠাৎ দরজা বন্ধ,
নেহাৎ এটার ঠাট্টার মতো ছন্দ।
বোকার মতন গম্ভীর মুখটারে
অট্টহাস্যে সহজ করিনু,
ফিরিনু আপন দ্বারে॥

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই
না-থাকার ফিলজাফি
মনটাকে ধরে চাপি।
থাকাটা আকস্মিক,
না-থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে
চেয়ে আছে অনিমিখ।
সন্ধ্যাবেলায় আলোটা নিবিয়ে
বসে বসে গৃহকোণে
না-থাকার এক বিরাট স্বরূপ
আঁকিতেছি মনে মনে।
কালের প্রান্তে চাই,
ঐ বাড়িটার আগাগোড়া কিছু নাই।
ফুলের বাগান কোথা তার উদ্দেশ,
বসিবার সেই আরাম কেদারা
পুরোপুরি নিঃশেষ।
মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
তুই তুই মালী একেবারে সব মিছে।
ক্রেসান্থেমাম্ কার্নেশানের
কেয়ারি সমেত তারা
নাই-গহ্বরে হারা।
চেয়ে দেখি দূর পানে
সেই ভাবীকালে যাহা আছে যেইখানে
উপস্থিতের ছোটো সীমানায়
সামান্য তাহা অতি
হেথায় সেথায় বুদ্বুদসংহতি।
যাহা নাই তাই বিরাট বিপুল মহা।

অনাদি অতীত যুগের প্রবাহ-বহা
অসংখ্য ধন, কণামাত্রও তার
নাই নাই হায়, নাই সে কোথাও আর ॥
দূর করো ছাই—এই বলে শেষে
যেমনি জ্বালিনু আলো
ফিলজফিটার কুয়াশা কোথা মিলালো।
স্পষ্ট বুঝিনু যা-কিছু সমুখে আছে,
চক্ষের পরে যাহা বক্ষের কাছে
সেই তো অন্তহীন
প্রতিপল প্রতিদিন।
যা আছে তাহারি মাঝে
যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
সত্য হইয়া রাজে।
অতীতকালের যে ছিলেম আমি
আজিকার আমি সেই
প্রত্যেক নিমেষেই।
বাঁধিয়া রেখেছে এই মুহূর্ত্ত জাল
সমস্ত ভাবী কাল ॥
অতএব সেই কেদারাটা যেই
জানালায় লব টানি
বসিব আরামে সে মুহূর্ত্তেরে
চিরদিবসের জানি।
অতএব জেনো সন্ন্যাসী হবনাকো,
আরবার যদি ডাকো
আবার সে ঐ মাইক্রোব্-ওড়া পথে
চলিব মোটর রথে।

ঘরে যদি কেহ রয়
নাই বলে তারে ফিলজফারের
হবে নাকো সংশয়।
দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্
কবি তবে কবে, "এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রং।"

চৈত্র, ১৩৩৮

দিনাবসান

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান্ বেলা তাসে পাশায়,
নাইবা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ॥

আমি জানি, মনে মনে,
সেঁউতি যুথী জবা
আন্‌বে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।
বর্ষা শরৎ বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরী
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমাব আসন পবে
স্নিগ্ধ শ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তবে স্তবে
আঁকন আঁকা হবে।
আমাব মৌন করবে পূর্ণ
পাখীব কলরবে॥

জানি আমি এই বারতা
রইবে অবণ্যেতে—
ওদেব সুবে কবিব কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে।
ফাগুন হাওয়ায় শ্রাবণ ধাবে
এই বাবতাই বাবে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বাবে দ্বাবে
উঠ্‌বে হঠাৎ বাজি;
কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বাবতা উঠ্‌বে জেগে
রঙীন বেশে সাজি।

স্মরণ সভার আসন আমার
সোনায় দেবে মাজি ॥
আমার স্মৃতি থাক্‌না গাঁথা
আমার গীতি মাঝে,
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
মর্ম্মরিয়া বাজে ।
যেখানে ঐ শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণ-কণা-মালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের বেশে করে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি ॥

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ, ১৩৩৩

পথসঙ্গী

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছিলে যে পথের সাথী
দিবসে এনেছ পিপাসার জল
রাত্রে জ্বেলেছ বাতি ।

আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনায়,
পথ হয় অবসান,
তোমার লাগিয়া রেখে যাই মোর
শুভ কামনার দান।
সংসার-পথ হোক্ বাধাহীন,
নিয়ে যাক্ কল্যাণে,
নব নব ঐশ্বর্য্য আনুক
জ্ঞানে কর্ম্মে ও ধ্যানে।
মোর স্মৃতি যদি মনে রাখো কভু
এই বলে রেখো মনে—
ফুল ফুটায়েছি, ফল যদিও ব'
ধরে নাই এ জীবনে॥

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্ম্মে তাহাব শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভবি দিলে।
তোমার হৃদয় আমাব হৃদয়ে
সে আলোকে যায় মিলে।

তেহেরান
২৫ বৈশাখ, ১৩৩৯

অন্তর্হিতা

তুমি যে তারে দেখো নি চেয়ে
জানিত সে তা মনে,—
ব্যথার ছায়া পড়িত ছেয়ে
কালো চোখের কোণে।
জীবনশিখা নিবিল তার,—
ডুবিল তারি সাথে
অবমানিত দুঃখভার
অবহেলার রাতে।
দীপাবলীর থালাতে নাই
তাহার ম্লান হিয়া,
তারায় তারি আলোক তাই
উঠিল উজলিয়া।
স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি
ভাষাবিহীন মুখে,
বহুজনের বাণীরে ঠেলি
বাজে কি তব বুকে।
নিকটে তব এসেছিল যে,
সে কথা বুঝাবারে
অসীম দূরে গিয়েছে ও যে
শূন্যে খুঁজাবারে।

সেখানে গিয়ে করেছে চুপ.
ভিক্ষা গেল থামি
তাই কি তার সত্যরূপ
হৃদয়ে এল নামি ॥

১ আষাঢ়, ১৩৩৯

আশ্রমবালিকা

শ্রীমতী মমতা সেনের বিবাহ উপলক্ষ্যে

আশ্রমের হে বালিকা,
আশ্বিনের শেফালিকা
ফাল্গুনের শালের মঞ্জরী
শিশুকাল হতে তব
দেহে মনে নব নব
যে মাধুর্য্য দিয়েছিল ভরি,
মাঘের বিদায়ক্ষণে
মুকুলিত আম্রবনে
বসন্তের যে নব দূতিকা,
আষাঢ়ের রাশি রাশি
শুভ্র মালতীর হাসি,
শ্রাবণের যে সিক্ত যূথিকা,
ছিল ঘিরে রাত্রিদিন
তোমারে বিচ্ছেদহীন
প্রান্তরের যে শান্তি উদার—

প্রত্যুষের জাগরণে
পেয়েছ বিস্মিত মনে
যে আস্বাদ আলোক সুধার,
আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘে
যখন উঠিত জেগে
আকাশের নিবিড় ক্রন্দন,
মর্ম্মরিত গীতিকায়
সপ্তপর্ণ বীথিকায়
দেখেছিলে যে প্রাণস্পন্দন,
বৈশাখের দিনশেষে
গোধূলিতে রুদ্রবেশে
কাল-বৈশাখীর উন্মত্ততা—
সে ঝড়ের কলোল্লাসে
বিদ্যুতের অট্টহাসে
শুনেছিলে যে মুক্তি-বারতা,—
পউষের মহোৎসবে
অনাহত বীণারবে
লোকে লোকে আলোকের গান
তোমার হৃদয়-দ্বারে
আনিয়াছে বারে বারে
নবজীবনের যে আহ্বান,—
নব বরষের রবি
যে উজ্জ্বল পুণ্যছবি
এঁকেছিল নির্ম্মল গগনে,
চির-নূতনের জয়
বেজেছিল শূন্যময়
বেজেছিল অন্তর অঙ্গনে—

কত গান কত খেলা,
কত না বন্ধুর মেলা,
প্রভাতে সন্ধ্যায় আরাধনা,
বিহঙ্গ কূজন সাথে
গাছের তলায় প্রাতে
তোমাদের দিনের সাধনা,—
তারি স্মৃতি শুভক্ষণে
সমস্ত জীবনে মনে
পূর্ণ করি নিয়ে যাও চলে,
চিত্ত করি ভরপূর
নিত্য তারা দিক্ সুর
জনতার কঠোর কল্লোলে।
নবীন সংসারখানি
রচিতে হবে যে জানি
মাধুরীতে মিশায়ে কল্যাণ,
প্রেম দিয়ে, প্রাণ দিয়ে,
কাজ দিয়ে গান দিয়ে
ধৈর্য্য দিয়ে, দিয়ে তব ধ্যান,—
সে তব রচনামাঝে
সব ভাবনায় কাজে
তারা যেন উঠে রূপ ধরি,
তারা যেন দেয় আনি
তোমার বাণীতে বাণী
তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি।
সুখী হও, সুখী রহ
পূর্ণ করো অহরহ
শুভকর্ম্মে জীবনের ডালা,

পুণ্যসূত্রে দিনগুলি
প্রতিদিন গেঁথে তুলি
রচি লহ নৈবেদ্যের মালা।
সমুদ্রের পার হতে,
পূর্ব্বপবনের স্রোতে,
ছন্দের তরণীখানি ভরে,
এ প্রভাতে আজি তোরি
পূর্ণতার দিন স্মরি
আশীর্ব্বাদ পাঠাইনু তোরে॥

১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

বধূ

শ্রীমতী অমিতা সেনের পরিণয় উপলক্ষ্যে

মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্ধম
গর্জ্জি উঠে ;
অতীত তিমির-গর্ভ হতে তুরঙ্গম
তরঙ্গ ছুটিছে শূন্যে ;
উন্মেষিছে মহা ভবিষ্যৎ।
বর্ত্তমান কালতটে অগ্নিগর্ভ অপূর্ব্ব পর্ব্বত
সদ্যোজাত মহিমায় উড়ায় উজ্জ্বল উত্তরীয়
নব সূর্য্যোদয় পানে।
যে অদৃষ্ট, যে অভাবনীয়
মানুষের ভাগ্যলিপি লিখিতেছে অজ্ঞাত অক্ষরে

দৃপ্ত বীর মূর্ত্তি ধরি, দেখিয়াছি ;
তার কণ্ঠস্বরে
শুনেছি দীপক রাগে সৃষ্টিবাণী মরণ-বিজয়ী
প্রাণমন্ত্রে ।
এই ক্ষুব্ধ যুগান্তর মাঝে, বৎসে অয়ি,
তোমারে হেরিনু বধূবেশে,
নির্ঝরিণী নৃত্যশীলা,
সহসা মিলিছ সরোবরে,
চটুল চঞ্চল লীলা
গভীরে করিছ মগ্ন ;
নির্ভয়ে নিখিল করি পণ
নব জীবনের সৃষ্টি-রহস্য করিছ উন্মোচন ।
ইতিহাস-বিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্ব-দুঃখ সুখে
দেশে দেশে যে বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে
যুগে যুগে,
নবনারী হৃদয়ের আকাশে আকাশে
এও সেই সৃষ্টিলীলা জ্যোতির্ম্ময় বিশ্ব ইতিহাসে ॥

৩ আষাঢ়, ১৩৩৯

মিলন

শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে

সেদিন উষার নববীণা-ঝঙ্কারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা ।
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোর-পরপারে
পাখী দুটি উন্মনা ।

দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা।
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা॥
কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি
মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোঁহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথী,
কোথাও ছিল না মানা।
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি
দোঁহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি,
পুষ্পিত শ্যামলতা।
চারিদিক হতে বিরাটের মহাবাণী
শুনালো দোঁহারে ভাষার অতীত কথা॥
মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী
বেদনা আনিল কী অনির্ব্বচনীয়।
দোঁহার চিত্তে উচ্ছসি উঠে ধ্বনি—
"প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।"
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে পাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এলো তারি,
এলে নামি ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছাড়ি
পরাণে পরাণে গান মিলাইলে গানে॥

দার্জ্জিলিং
১৭ কার্ত্তিক, ১৩৩৮

স্পাই

শক্ত হোলো বোগ,
হপ্তা-পাঁচেক ছিল আমাব ভোগ।
একটুকু যেই সুস্থ হলেম পরে
লোক ধবে না ঘরে,
ব্যামোব চেয়ে অনেক বেশি ঘটালো দুর্য্যোগ।
এল ভবেশ, এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান,
এল পোলিটিশান,
এল গোকুল সংবাদপত্রেব,
খবব বাখে সকল পাড়াব নাড়ী নক্ষত্রেব।
কেউবা বলে বদল কবো হাওয়া,
কেউবা বলে ভালো করে কববে খাওয়া দাওয়া।
কেউবা বলে, মহেন্দ্র ডাক্তাব
এই ব্যামোতে তাব মতো কেউ ওস্তাদ নেই আব।
দেয়াল ঘেঁষে ঐ যে সবাব পাছে
সতীশ বসে আছে।
থাকে সে এই পাড়ায়,
চুলগুলো তাব ঊর্দ্ধে তোলা পাঁচ আঙুলেব নাড়ায়।
চোখে চষমা আঁটা,
এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পবকলাটা।
গলার বোতাম খোলা,
প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে ভোলা।

সর্ব্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
হঠাৎ খুলে পাতা
লুকিয়ে লুকিয়ে কী যে লেখে, হয়ত বা সে কবি
কিম্বা আঁকে ছবি।
নবীন আমায় শোনায় কানে কানে,
ঐ ছেলেটার গোপন খবর নিশ্চিত সে-ই জানে—
যাকে বলে 'স্পাই'
সন্দেহ তার নাই।
আমি বলি, হবেও বা, ভক্তি নম্র নিরীহ ঐ মুখে
খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্চে টুঁকে।
ও মানুষটা সত্যি যদি তেম্‌নি হেয় হয়,
ঘৃণা করব,—কেন করব ভয়॥
এই বছরে বছরখানেক বেড়িয়ে নিলেম পাঞ্জাবে কাশ্মীরে।
এলেম যখন ফিরে;
এল গণেশ, পল্টু এল, এল নবীন পাল,
এল মাখনলাল।
হাতে একটা মোড়ক নিয়ে প্রণাম করলে পাঁচু,
মুখটা কাঁচু মাচু।
'মনিব কোথায়', শুধাই আমি তারে
'সতীশ কোথায় হাঁ রে?'
নবীন বললে, 'খবর পান নি তবে,
দিন পনেরো হবে—
উপোষ করে মারা গেল সোনার টুক্‌রো ছেলে
নন্‌-ভায়োলেন্‌স্‌ প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে।'
পাঁচু আমার হাতে দিল খাতা,
খুলে দেখি পাতার পরে পাতা—

দেশের কথা কী বলেছি তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে,
পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে।
আজকে বসে বসে ভাবি. মুখের কথাগুলো
ঝরা পাতার মতোই তারা ধূলোয় হত ধূলো।
সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে কি এ
মৃত্যু-সুধার নিত্য পরশ দিয়ে॥

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

ধাবমান

যেয়ো না যেয়ো না বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন।
কোথা সে বন্ধন
অসীম যা করিবে সীমারে।
সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে
এ পারের সব কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে,
অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে,
নয়, নয়, এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল সমুদ্রের পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর মাঝে—
নয় নয় নয়।
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়।

যাবে সব যাবে চলে, তবু ভালোবাসি,—
চমকে বিনাশ মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণা-তারে উঠে জেগে
জীবনের গান ;
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি
শাশ্বতের দীপশিখা
উজ্জ্বলিয়া মুহূর্ত্তের মরীচিকা।
অতল কান্নার স্রোত মাতার করুণ স্নেহ বয়,
প্রিয়ের হৃদয় বিনিময়।
বিলোপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বীর্য্যমদ
ধরণীর সৌন্দর্য্য সম্পদ।
অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।
কাল ব্যাপি রহে নাই রহে
তবু সে মহান্ ;
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ।
ধায় যবে বিদায়ের রথ
জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ
আপনারে ভুলি।
যতটুকু ধূলি
আছ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কী রহে না, তুচ্ছ সে বিচার।

বিরাটের মাঝে
এক রূপে নাই হয়ে অন্যরূপে তাহাই বিরাজে।
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দ স্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্বুদ তোর অশোক সমুদ্রে যাবে ভেসে॥

৬ আষাঢ়, ১৩৩৯

ভীরু

তাকিয়ে দেখি পিছে
সেদিন ভালোবেসেছিলেম
দিন না যেতেই হয়ে গেল মিছে।
বলার কথা পাইনি,আমি খুঁজে,
আপনা হতে নেয়নি কেন বুঝে,
দেবার মতন এনেছিলেম কিছু
ডালির থেকে পড়ে গেল নীচে॥
ভরসা ছিল না যে,
তাই তো ভেবে দেখিনি হায়
কী ছিল তার হাসির দ্বিধার মাঝে।
গোপন বীণা সুরেই ছিল বাঁধা,
ঝঙ্কার তায় দিয়েছিল আধা,
সংশয়ে আজ তলিয়ে গেল কোথা,
পাব কি তায় দুঃখ সাগর সিচেঁ॥

হায়রে গরবিণী,
বারেক তব করুণ চাহনিতে
ভীরুতা মোর লওনি কেন জিনি।
যে মণিটি ছিল বুকের হারে
ফেলে দিলে কোন্ খেদে হায় তারে,
ব্যর্থ রাতের অশ্রু-ফোঁটার মালা
আজ তোমার ঐ বক্ষে ঝলকিছে॥

৯ আষাঢ়, ১৩৩৮

বিচার

বিচার করিয়ো না।
যেখানে তুমি রয়েছ, সে তো
জগতে এক কোণা।
যেটুকু তব দৃষ্টি যায়
সেটুকু কতখানি,
যেটুকু শোনো, তাহার সাথে
মিশাও নিজ বাণী।
মন্দ ভালো সাদা ও কালো
রাখিছ ভাগে ভাগে।
সীমানা মিছে আঁকিয়া তোলো
আপন রচা দাগে॥
সুরের বাঁশি যদি তোমার
মনের মাঝে থাকে,
চলিতে পথে আপন মনে,
জাগায়ে দাও তাকে।

গানের মাঝে তর্ক নাই,
কাজের নাই তাড়া।
যাহার খুসি চলিয়া যাবে
যে খুসি দিবে সাড়া।
হোক্ না তারা কেহ বা ভালো
কেহ বা ভালো নয়,
এক পথেরি পথিক তারা
লহো এ পরিচয়॥

বিচার করিয়ো না।
হায়রে হায়, সময় যায়,
বৃথা এ আলোচনা।
ফুলের বনে বেড়ার কোণে
হেরো অপরাজিতা
আকাশ হতে এনেছে বাণী,
মাটির সে যে মিতা।
ঐ তো ঘাসে আষাঢ় মাসে
সবুজে লাগে বান,—
সকল ধরা ভরিয়া দিল
সহজ তার দান।
আপনা ভুলি সহজ সুখে
ভরুক তব হিয়া
পথিক তব পথের ধন
পথেরে যাও দিয়া॥

১০ আষাঢ়, ১৩৩৯

পুরানো বই

আমি জানি
পুরাতন এই বইখানি।
অপঠিত, তবু মোর ঘরে
আছে সমাদরে।
এর ছিন্ন পাতে পাতে তার
বাষ্পাকুল করুণার
স্পর্শ যেন রয়েছে বিলীন।
সে যে আজ হোলো কতদিন।
সরল দুখানি আঁখি ঢলোঢলো,
বেদনার আভাসেই করে ছলোছলো ;
কালো পাড় সাড়িখানি মাথার উপর দিয়ে ফেরা,
দুটি হাত কঙ্কণে ও সান্ত্বনায় ঘেরা।
জনহীন দ্বিপ্রহরে
এলোচুল মেলে দিয়ে বালিশের পরে,
এই বই তুলে নিয়ে বুকে
একমনে স্নিগ্ধ মুখে
বিচ্ছেদ কাহিনী যায় পড়ে।
জানালা বাহিরে শূন্যে ওড়ে
পায়রার ঝাঁক,
গলি হতে দিয়ে যায় ডাক
ফেরি-ওলা,
পাপোষের পরে ভোলা

ভক্ত সে কুকুর
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ছাড়ে আর্ত্তস্বর।
সময়ের হয়ে যায় ভুল :
গলির ওপারে স্কুল,
সেথা হতে বাজে যবে
কাংস্যরবে
ছুটির ঘণ্টার ধ্বনি,
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখনি
তাড়াতাড়ি
ওঠে সে শয়ন ছাড়ি,
গৃহকার্য্যে চলে যায় সচকিতে
বইখানি রেখে কুলুঙ্গিতে।
অন্তঃপুর হতে অন্তঃপুরে
এই বই ফিরিয়াছে দূর হতে দূরে।
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে
খ্যাতি এর ব্যাপিয়াছে দখিণে ও বামে॥
তার পরে গেল সেই কাল,
ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সৃষ্টির মায়াজাল।
এ লজ্জিত বই
কোনো ঘরে স্থান এর কই।
নবীন পাঠক আজ বসি কেদারায়
ভেবে নাহি পায়
এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়॥

জানালা বাহিরে নীচে ট্রাম যায় চলি।
প্রশস্ত হয়েছে গলি।
চলে গেছে ফেরি-ওলা, সে পসরা তার
বিকায় না আর।
ডাক তার ক্লান্ত সুরে
দূর হতে মিলাইল দূরে।
বেলা চলে গেল কোন্ ক্ষণে,
বাজিল ছুটির ঘণ্টা ও-পাড়ার সুদূর প্রাঙ্গণে॥

১১ আষাঢ়, ১৩৩৯

বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি।
রাত্রি হোলো ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।
ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা,
হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর।

বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়।
কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্ত-পঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা।
সে বিরাট
ধ্বংস-ধারা মাঝে আজি আমার ললাট
পেলো অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে,
এই তো বিস্ময় অন্তহীন।
আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্ক সভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে।
আছি হিমাদ্রির সাথে,
আছি সপ্তর্ষির সাথে,
আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা।
এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—
জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে॥

১২ আষাঢ়, ১৩৩৯

খেলনার মুক্তি

এক আছে মণি দিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানী পুতুল,
নাম হানাসান।
পরেছে জাপানী পেশোয়াজ,
ফিকে সবুজের পরে ফুল কাটা সোনালি-রঙের।
বিলেতের হাট থেকে এলো তার বর ;
সেকালের রাজপুত্র কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা,
মাথার টুপিতে উঁচু পাখীর পালখ,
কাল হবে অধিবাস পর্শু হবে বিয়ে॥
সন্ধ্যে হোলো।
পালঙ্কেতে শুয়ে হানাসান।
জ্বলে ইলেক্‌ট্রিক বাতি।
কোথা থেকে এলো এক কালো চামচিকে,
উড়ে উড়ে ফেরে ঘুরে ঘুরে,
সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া।
হানাসান ডেকে বলে,
"চাম্‌চিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেল্‌না হয়ে,—
যেখানে খেলার স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়॥"

মণি দিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেলো, কোথা গেলো।
বটগাছে আঙিনাব পারে
বাসা করে আছে ব্যাঙ্গমা,
সে বলে, "আমি তো জানি,
চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।"
মণি বলে, "হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা,
আমাকেও নিয়ে চলো,
ফিরিয়ে আনি গে॥"
ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা,
মণি দিদি উড়ে চলে সারারাত্রি ধরে।
ভোব হোলো, এলো চিত্রকূটগিরি,
সেইখানে মেঘেদের পাড়া।
মণি ডাকে,"হানাসান, কোথা হানাসান,
খেলা যে আমার পড়ে আছে॥"
নীল মেঘ বলে এসে
"মানুষ কি খেলা জানে?
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে।"
মণি বলে, "তোমাদেব খেলা কী বকম?"
কালো মেঘ ভেসে এলো,
হেসে চিকিমিকি,
ডেকে গুরুগুরু
বলে, "ঐ চেয়ে দেখো, হানাসান হোলো নানা খানা,
ওব ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়,

নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে,
আলোতে আলোতে ॥”

মণি বলে, “ব্যাঙ্‌গমা দাদা,
এদিকে বিয়ে যে ঠিক
বর এসে কী বলবে শেষে ?”
ব্যাঙ্‌গমা হেসে বলে,
“আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্য্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।”
মণি কেঁদে বলে, “তবে,
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা ?”
ব্যাঙ্‌গমা বলে “মণি দিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টিধোওয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিন্‌বে না কেউ ॥”

১৩ আষাঢ়, ১৩৩৯

পত্রলেখা

দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন্,—
কত মতো লেখার আসবাব।
ছোটো ডেস্‌কোখানি
আখরোট কাঠ দিয়ে গড়া।
ছাপ-মারা চিঠির কাগজ
নানা বহরের।
রূপোর কাগজ-কাটা, এনামেল করা।
কাঁচি ছুরি গালা লাল ফিতে।
কাঁচের কাগজ-চাপা,
লাল নীল সবুজ পেন্সিল।
বলে গিয়েছিলে তুমি চিঠিলেখা চাই
একদিন পরে পরে॥
লিখতে বসেছি চিঠি,
সকালেই স্নান হয়ে গেছে।
লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাইনে তো।
একটি খবর আছে শুধু,—
তুমি চলে গেছ।
সে খবর তোমারো তো জানা।
তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জানো না।
তাই ভাবি এ কথাটি জানাই তোমাকে—
তুমি চলে গেছ।

যতবার লেখা সুরু করি
ততবার ধরা পড়ে এ খবর সহজ তো নয়।
আমি নই কবি,
ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারিনে তো দিতে ;
না থাকে চোখের চাওয়া।
যত লিখি তত ছিঁড়ে ফেলি॥
দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্‌কুলে,
যাই তাকে খাইয়ে আসি গে।
শেষবার এই লিখে যাই,—
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যত কিছু
হিজি বিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের পরে।

১৪ আষাঢ়, ১৩৩৯

অগোচর

হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি,
হাজার হাজার মুখ হাজার হাজার ইতিহাস
ঢাকা দিয়ে আসে যায় দিনের আলোয়
রাতের আঁধারে।
সব কথা তার
কোনো কালে জানবে না কেউ
নিজেও জানে না কোনো লোক।

মুখর আলাপ তার, উচ্চস্বরে কত আলোচনা,
তারি অন্তস্তলে
বিচিত্র বিপুল
স্মৃতি বিস্মৃতির সৃষ্টি রাশি।
সেখানে তো শব্দ নেই, আলো নেই,
বাইরের দৃষ্টি নেই,
প্রবেশের পথ নেই কারো।
সংখ্যাহীন মানুষের
এই যে প্রচ্ছন্নবাণী, অশ্রুত কাহিনী
কোন্ আদি কাল হোতে
অন্তঃশীল অগণ্যধারায়
আঁধার মৃত্যুর মাঝে মেশে রাত্রিদিন,
কী হোলো তাদের
কী এদের কাজ।

হে প্রিয়, তোমার যতটুকু
দেখেছি শুনেছি
জেনেছি, পেয়েছি স্পর্শ করি—
তার বহু শতগুণ অদৃশ্য অশ্রুত
রহস্য কিসের জন্য বন্ধ হয়ে আছে,
কার অপেক্ষায়।
সে নিরালা ভবনের
কুলুপ তোমার কাছে নেই।
কার কাছে আছে তবে।
কে মহা অপরিচিত যার অগোচর সভাতলে
হে চেনা-অপরিচিত তোমার আসন।

সেই কি সবার চেয়ে জানে
আমাদের অন্তরের অজানারে।
সবার চেয়ে কি বড়ো তার ভালোবাসা
যার শুভদৃষ্টি কাছে
অব্যক্ত করেছে অবগুণ্ঠন মোচন॥

১৪ আষাঢ়, ১৩৩৯

সান্ত্বনা

যে বোবা দুঃখের ভার
ওরে দুঃখী, বহিতেছ, তার কোনো নেই প্রতিকার।
সহায় কোথাও নাই, ব্যর্থ প্রার্থনায়
চিত্তদৈন্য শুধু বেড়ে যায়॥
ওরে বোবা মাটি,
বক্ষ তোর যায়না তো ফাটি
বহিয়া বিশ্বের বোঝা দুঃখ বেদনার
বক্ষে আপনার
বহুযুগ ধরে।
বোবা গাছ ওরে,
সহজে বহিস্ শিরে বৈশাখের নির্দ্দয় দাহন,
তুই সর্ব্বসহিষ্ণু বাহন
শ্রাবণের
বিশ্বব্যাপী প্লাবনের॥

তাই মনে ভাবি
যাবে নাবি
সর্ব্ব দুঃখ সন্তাপ নিঃশেষে
উদাব মাটিব বক্ষোদেশে
গভীর শীতল
যাব স্তব্ধ অন্ধকাব তল
কালের মথিত বিষ নিরন্তব নিতেছে সংহবি।
সেই বিলুপ্তিব পবে দিবা-বিভাববী
তুলিছে শ্যামল তৃণস্তর
নিঃশব্দ সুন্দব।
শতাব্দীব সব ক্ষতি সব মৃত্যুক্ষত
যেখানে একান্ত অপগত
সেইখানে বনস্পতি প্রশান্ত গম্ভীব
সূর্য্যোদয় পানে তোলে শিব,
পুষ্প তাব পত্রপুটে
শোভা পায় ধবিত্রীর মহিমা মুকুটে॥
বোবা মাটি. বোবা তরুদল,
ধৈর্য্যহাবা মানুষেব বিশ্বেব দুঃসহ কোলাহল
স্তব্ধতায় মিলাইছ প্রতি মুহূর্ত্তেই,—
নির্ব্বাক সান্ত্বনা সেই
তোমাদেব শান্তরূপে দেখিলাম,
করিনু প্রণাম।
দেখিলাম সব ব্যথা প্রতিক্ষণে লইতেছে জিনি
সুন্দরেব ভৈরবী রাগিণী
সর্ব্ব অবসানে
শব্দহীন গানে॥

১৫ আষাঢ়, ১৩৩৯

ছোটো প্রাণ

ছিলাম নিদ্রাগত,
সহসা আর্ত্তবিলাপে কাঁদিল
রজনী ঝঞ্ঝাহত।
জাগিয়া দেখিনু পাশে
কচি মুখখানি সুখনিদ্রায়
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে।
সংসার পরে এই বিশ্বাস
দৃঢ় বাঁধা স্নেহডোরে
বজ্র আঘাতে ভাঙে তা কেমন করে॥
সৈন্যবাহিনী বিজয়কাহিনী
লিখে ইতিহাস জুড়ে।
শক্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ
তুলিছে আকাশ ফুঁড়ে।
সম্পদ সমারোহ
গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে
স্বর্ণ-মরীচি মোহ।
সেথায় আঘাত সংঘাত বেগে
ভাঙাচোরা যত হোক্
তার লাগি বৃথা শোক॥
কিন্তু হেথায় কিছু তো চাহেনি এরা।
এদের বাসাটি ধরণীর কোণে
ছোটো ইচ্ছায় ঘেরা।

যেমন সহজে পাখীর কুলায়
মৃদু কণ্ঠের গীতে
নিভৃত ছায়ায় ভরা থাকে মাধুরীতে।
হে রুদ্র, কেন তারো পরে বাণ হানো,
কেন তুমি নাহি জানো
নির্ভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো,
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমার আলো॥

১৫ আষাঢ়, ১৩৩৯

নিরাবৃত

যবনিকা অন্তরালে মর্ত্ত্য পৃথিবীতে
ঢাকা-পড়া এই মন।
আভাসে ইঙ্গিতে
প্রমাণে ও অনুমানে আলোতে আঁধারে
ভাঙা খণ্ড জুড়ে সে-যে দেখেছে আমারে
মিলায়ে তাহার সাথে নিজ অভিরুচি
আশা তৃষা।
বারবার ফেলেছিল মুছি
রেখা তার,
মাঝে মাঝে করিয়া সংস্কার
দেখেছে নূতন করে মোরে।

কতবার
ঘটেছে সংশয়।
এই যে সত্যে ও ভুলে
রচিত আমার মূর্ত্তি,
সংসারের কূলে
এ নিয়ে সে এতদিন কাটায়েছে বেলা।
এরে ভালোবেসেছিল,
এরে নিয়ে খেলা
সাঙ্গ করে চলে গেছে।
বসে একা ঘরে
মনে মনে ভাবিতেছি আজ,
লোকান্তরে
যদি তার দিব্য আঁখি মায়ামুক্ত হয়
অকস্মাৎ,
পাবে যার নব পরিচয়
সে কি আমি?
স্পষ্ট তারে জানুক যতই
তবু যে অস্পষ্ট ছিল তাহারি মতোই
এরে কি আপনি রচি বাসিবে সে ভালো?
হায়রে মানুষ এ যে।
পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে,
সৃষ্টির চাতুরী
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি।
সে মায়াতে বেঁধেছিনু মর্ত্ত্যে মোরা দোঁহে
আমাদের খেলাঘর,

অপূর্ণের মোহে

মুগ্ধ ছিনু,

মর্ত্ত্য-পাত্রে পেয়েছি অমৃত।

পূর্ণতা নির্ম্মম সে যে স্তব্ধ অনাবৃত॥

১৭ আষাঢ়, ১৩৩৯

মৃত্যুঞ্জয়

দূর হতে ভেবেছিনু মনে

দুর্জ্জয় নির্দ্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বি তোমার শাসনে।

তুমি বিভীষিকা,

দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।

দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে,

সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।

ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরু দুরু বুকে

তোমার সম্মুখে।

তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,—

নামিল আঘাত।

পাঁজর উঠিল কেঁপে,

বক্ষে হাত চেপে

শুধালেম, "আরো কিছু আছে না কি,

আছে বাকি

শেষ বজ্রপাত?

নামিল আঘাত।

এইমাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গণি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে॥

১৮ আষাঢ়, ১৩৩৯

অবাধ

সরে যা, ছেড়ে দে পথ,
দুর্ভর সংশয়ে ভারী তোর মন পাথরের পারা।
হাল্‌কা প্রাণের ধারা
দিকে দিকে ঐ ছুটে চলে
কল কোলাহলে
দুরন্ত আনন্দভরে।
ওরাই যে লঘু করে
অতীতের পুরাতন বোঝা।
ওরাই তো করে দেয় সোজা

সংসারের বক্র ভঙ্গী চঞ্চল সংঘাতে।
ওদের চরণপাতে
জটিল জালের গ্রন্থি যত
হয় অপগত।
মলিনতা দেয় মেজে
শ্রান্তি দূর করে ওরা ক্লান্তিহীন তেজে॥

ওরা সব মেঘের মতন
প্রভাত কিরণপায়ী,—সিন্ধুর তরঙ্গ অগণন,
ওরা যেন দিশাহারা হাওয়ার উৎসাহ,
মাটির হৃদয়জয়ী নিরন্তর তরুর প্রবাহ,
প্রাচীন রজনীপ্রান্তে ওরা সবে প্রথম আলোক।
ওরা শিশু, বালিকা বালক,
ওরা নারী যৌবনে উচ্ছল।
ওরা যে নির্ভীক বীরদল
যৌবনের দুঃসাহসে বিপদের দুর্গ হানে
সম্পদেরে উদ্ধারিয়া আনে।
পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলিয়াছে ঝঙ্কারিয়া
অন্তরে প্রবল মুক্তি নিয়া।
আগামী কালের লাগি নাই চিন্তা নাই মনে ভয়,
আগামী কালেরে করে জয়।
চলেছে চলেছে ওরা চারিদিক হতে
আঁধারে আলোতে,
সম্মুখের পানে
অজ্ঞাতের টানে।
তুই সরে যা রে
ওরে ভীরু, ভারাতুর সংশয়ের ভারে॥

১৮ আষাঢ়, ১৩৩৯

যাত্রী

যে কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা।
একে একে পাখী যায়, গানের পসরা
কোথাও না হয় শূন্য,
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুণ্ণ
বিপুল সংসার।
দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
নিমেষের বেড়া-ঘেরা এখানে ওখানে।
সে-বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না নিখিলের পানে।
ওরে তুমি, ওরে আমি
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি।
কান্না আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রী তারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলে যায় এসে।
তোমার হৃদয়-তাপ
তোমার বিলাপ

চাপা থাক্ আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্ব্বিকার চলো একসারে,
দেখা দাও শান্তি-সৌম্য আপনারে।
যে শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাগ্যে নিভৃত,
আত্মসমাহিত;
দিবসের যত
ধূলিচিহ্ন যত কিছু ক্ষত
লুপ্ত হোলো যে শান্তির অন্তিম তিমিরে;
সংসারের শেষ তীরে
সপ্তর্ষির ধ্যানপুণ্য বাতে
হারায় যে শান্তি সিন্ধু আপনার অন্ত আপনাতে;
যে শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে প্রেম শরীর মন অতিক্রম করিয়া সুদূরে,
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।
সে পরম শান্তি মাঝে হোক্ তব অচঞ্চল স্থিতি॥

১৮ আষাঢ়, ১৩৩৯

মিলন

তোমারে দিব না দোষ।
জানি মোর ভাগ্যের ভ্রূকুটী,
ক্ষুদ্র এই সংসারের যত ক্ষত, যত তার ত্রুটি,
যত ব্যথা

আঘাত করিছে তব পরম সত্তারে ;
জানি যে তুমি তো নাই কোনোদিন ছাড়ায়ে আমারে
নির্লিপ্ত সুদূর স্বর্গে।
আমি মোর তোমাতে বিরাজে ;
দেওয়া-নেওয়া নিরন্তর প্রবাহিত তুমি আমি মাঝে
দুর্গম বাধারে অতিক্রমি।
আমার সকল ভার
রাত্রিদিন রয়েছে তোমারি পরে,
আমার সংসার
সে শুধু আমারি নহে।
তাই ভাবি এই ভার মোর
যেন লঘু করি নিজবলে,
জটিল বন্ধন ডোর
একে একে ছিন্ন করি যেন,
মিলিয়া সহজ মিলে
দ্বন্দ্বহীন বন্ধহীন, বিচরণ করি এ নিখিলে
না চেয়ে আপনা পানে,
অশান্তিরে করি দিলে দূর
তোমাতে আমাতে মিলি ধ্বনিয়া উঠিবে এক সুর ॥

১৯ আষাঢ়, ১৩৩৯

খ্যাতি

ভাই নিশি,

তখন উনিশ আমি, তুমি হবে বুঝি

পঁচিশের কাছাকাছি।

তোমার দুখানা বই ছাপা হয়ে গেছে,

"ক্ষান্ত পিসি," তার পবে "পঞ্চুর মৌতাত।"

তা ছাড়া মাসিকপত্র কালচক্রে ক্রমে বেব হোলো

"রক্তের আঁচড়।"

হুলুস্থুল পড়ে গেল দেশে।

কলেজেব সাহিত্য সভায়

সেদিন বলেছিলেম বঙ্কিমের চেয়ে তুমি বড়ো,

তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি।

আমাকে ক্ষ্যাপাতো দাদা নিশি-পাওয়া বলে।

কলেজেব পালা শেষে

করেছি ডেপুটিগিবি,

ইস্তফা দিয়েছি কাজে স্বদেশীর দিনে।

তারপব থেকে, যা আমার

সৌভাগ্য অভাবনীয় তাই ঘটে গেল,

বন্ধুরূপে পেলেম তোমাকে।

কাছে পেয়ে কোনোদিন

তোমাকে কবিনি খাটো—

ছোটো বড়ো নানা ক্রটি সেও আমি হেসে ভালোবেসে

তোমার মহত্ত্বে সবই মিলিয়ে নিয়েছি।

এ ধৈর্য্য, এ পূর্ণদৃষ্টি, এও যে তোমারি কাছে শেখা।
দোষে ভরা অসামান্য প্রাণ,
সে চরিত্র রচনায় সব চেয়ে ওস্তাদী তোমার
সে তো আমি জানি॥

তার পরে কতবার অনুরোধ করেছ কেবলি,
বলেছিলে, "লেখো, লেখো, গল্প লেখো।
লেখকের মঞ্চে ছিল পিঠ-উঁচু তোমারি চৌকিটা।
আত্মঅবিশ্বাসে শুধু আট্‌কে পড়েছ
পড়ুয়ার নীচের বেঞ্চিতে।"
শেষকালে বহু ইতস্তত করে
লেখা করলেম সুরু॥
বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে,
পান্তিঘাটায়।
আসামী পোলিটিকাল,
সাতমাস পলাতকা।
মাকে দেখে যাবে বলে একদিন রাত্রে এসেছিল
প্রাণ হাতে করে।
খুড়ো গেল পুলিসে খবর দিতে।
কিছুদিন নিল সে আশ্রয়
জেলেনির ঘরে।
যখন পড়ল ধরা সত্য সাক্ষ্য দিল খুড়ো,
মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে জেলেনি।
জেলেনিকে দিতে হোলো জেলে,
খুড়ো হলো সাব্‌রেজিষ্ট্রার॥

গল্পখানা পড়ে
বিস্তর বাহবা দিয়েছিলে।

খাতাখানা নিজে নিয়ে
শম্ভু সাণ্ডেলের ঘরে
বলে এলে, কালচক্রে অবিলম্বে বের হওয়া চাই।
বের হোলো মাসে মাসে।
শুক্‌নো কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।
বাঁশরীতে লিখে দিল
কোথা লাগে আশুবাবু এ নবীন লেখকের কাছে।
শুনে হেসেছিলে তুমি।
পাঞ্চজন্যে লিখেছিল রতিকান্ত ঘোষ,
এতদিনে বাঙলা ভাষায়
সত্য লেখা পাওয়া গেল
ইত্যাদি ইত্যাদি।
এবার হাসোনি তুমি।
তার পর থেকে
তোমার আমার মাঝখানে
খ্যাতির কাঁটার বেড়া ক্রমে ঘন হোলো॥
এখন আমার কথা শোনো।
আমার এ খ্যাতি
আধুনিক মত্ততার ইঞ্চি দুই পলি মাটি পরে
হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা।
ষ্টুপিড জানে না
মূল এর বেশি দূর নয়,
ফল এর কোনোখানে নেই,
কেবলি পাতার ঘটা।

তোমার যে পঙ্কু সে তো বাঙ্লার ডন্ কুইক্সোট,
তার যা মৌতাত
সে যে জন্মক্ষ্যাপাদের মগজে মগজে
দেশে দেশে দেখা দেয় চিরকাল।
আমার এ কুঞ্জলাল তুবড়ির মতো
জ্বলে আর নেবে—
বোকাদের চোখে লাগে ধাঁধা।
আমি জানি তুমি কতখানি বড়ো।
এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাবো কি বন্ধুত্ব তোমার।
কাগজের মোড়কটা খুলে দেখো
আমার লেখার দগ্ধ শেষ।
আজ বাদে কাল হোতো ধুলো,
আজ হোক্ ছাই॥

২৪ আষাঢ়, ১৩৩৯

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।

মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিক্‌টিকি।
তফাৎ আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব ॥

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরী আফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইষ্টিশনে যাই,
সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্‌ ধস্‌,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তারপরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল,—

সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া,—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর॥

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাই পাঁশ আরো কত কি যে।
ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসায়ের মনটা যেমন,
সর্ব্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্চ্ছায় অসাড়।

দিন রাত মনে হয়, কোন্ আধমবা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

গলিব মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে পাট-কবা লম্বাচুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
সৌখীন মেজাজ।
কর্নেট বাজানো তাব সখ।
মাঝে মাঝে সুব জেগে ওঠে
এ গলিব বীভৎস বাতাসে
কখনো গভীব বাতে,
ভোববেলা আধো অন্ধকাবে—
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয় ছাযায।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বাবোয়াঁয় লাগে তান
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহ বেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধবা পড়ে
এ গলিটা ঘোব মিছে
দুর্ব্বিষহ মাতালেব প্রলাপেব মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবব বাদশার সঙ্গে
হবিপদ কেবানীর কোনো ভেদ নেই।
বাঁশিব করুণ ডাক বেয়ে

ছেঁড়াছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদূর॥

২৫ আষাঢ়, ১৩৩৯

উন্নতি

উপরে যাবার সিঁড়ি,
তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাষ্টারের কাছে
সকালে পড়তে হোত ইংলিশ রীডার
ভাঙা পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেঁতুলের গাছ।
ফল পাকবার বেলা
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হোত লাফালাফি।
ইংরেজি বানান ছেড়ে দুই চক্ষু ছুটে যেত
ল্যাজ-দোলা বাঁদরের দিকে।

সেই উপলক্ষ্যে—
আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের
নির্ভেদ নির্ণয় করে
মাষ্টার দিতেন কানমলা ॥
ছুটি হলে পরে
সুরু হোত আমার মাষ্টারি
উদ্ভিদ মহলে।
ফল্‌সা চালতা ছিল, ছিল সাববাঁধা
সুপুরির গাছ।
অনাহূত জন্মেছিল কী করে কুলেব এক চাবা
বাড়ির গা ঘেঁষে ;
সেটাই আমার ছাত্র ছিল।
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।
বল্‌তেম, "দেখ দেখি বোকা,
উঁচু ফলসার গাছে ফল ধরে গেল,
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।"
শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ
তার মধ্যে বারবার "উন্নতি" কথাটা শোনা যেত।
ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে
শেষকালে কে হয়েছে লক্ষপতি ধনী
সেই গল্প শুনে শুনে
উন্নতি যে কাকে বলে দেখেছি সুস্পষ্ট তার ছবি।
বড়ো হওয়া চাই—
অর্থাৎ নিতান্ত পক্ষে হতে হবে বাজিদপুরের
ভজু মল্লিকের জুড়ি।
ফলসার ফলে ভরা গাছ

বাগান মহলে সেই ভজু মহাজন।
চারাটাকে রোজ বোঝাতেম
ওরি মতো বড়ো হতে হবে।
কাঠি দিয়ে মাপি তাকে এবেলা ওবেলা,
আমারি কেবল রাগ বাড়ে,
আর কিছু বাড়ে না তো।
সেই কাঠি দিয়ে তাকে মারি শেষে সপাসপ জোরে,—
একটু ফলেনি তাতে ফল।
কান-মলা যত দিই
পাতাগুলো মলে মলে,
ততই উন্নতি তার কমে॥
ইদিকে ছিলেন বাবা ইন্‌কম্‌-ট্যাক্সো-কালেক্টার,
বদলি হলেন
বর্দ্ধমান ডিভিজনে।
উচ্চ ইংরেজির স্কুলে পড়া সুরু করে
উচ্চতার পূর্ণ পরিণতি
কলকাতা গিয়ে॥
বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।
বহুকষ্টে বহু ঋণ করে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল
আগামী ফাল্গুনমাসে নবমী তিথিতে।
নববসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হোলো যেই—
এমন সময়ে, রিডাক্‌শান।

পোকা-খাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্যি টুপটুপে,
ঝুপ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়,
আমার সে দশা।
বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হোলো
সে কেবল আমারি কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ,
ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,
শুক্‌নো মুখ,
চোক গেছে বসে,
তুবড়ে গিয়েছে পেট,
জুতোটার তলা ছেঁড়া,
দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের
ঘুচে গেছে বর্ণভেদ,
ঘুরে মরি বড়োলোকদের দ্বারে।
এমন সময় চিঠি এল,
ভজু মহাজন
দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটে বাড়িখানা॥
বাড়ি গিয়ে উপরের ঘরে
জানলা খুল্‌তে সেটা ডালে ঠেকে গেল।
রাগ হোলো মনে—
ঠেলাঠেলি করে দেখি—
আরে আরে ছাত্র যে আমার!

শেষকালে বড়োই তো হোলো,
উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে
ভজু মল্লিকেরি মতো আমার দুয়ারে দিয়ে হানা॥

২৬ আষাঢ়, ১৩৩৯

আগন্তুক

এসেছি সুদূর কাল থেকে।
তোমাদের কালে
পৌঁছলেম যে সময়ে
তখন আমার সঙ্গী নেই।
ঘাটে ঘাটে কে কোথায় নেবে গেছে।
ছোটো ছোটো চেনা সুখ যত,
প্রাণের উপকরণ,
দিনের রাতের মুষ্টিদান
এসেছি নিঃশেষ করে বহুদূর পারে।
এ জীবনে পা দিয়েছি প্রথম যে কালে
সে কালের 'পরে অধিকার
দৃঢ় হয়েছিল দিনে দিনে
ভাবে ও ভাষায়,
কাজে ও ইঙ্গিতে,
প্রণয়ের প্রাত্যহিক দেনাপাওনায়।
হেসে খেলে কোনো মতে সকলের সঙ্গে বেঁচে থাকা,
লোকযাত্রা-রথে

কিছু কিছু গতি-বেগ দেওয়া,
শুধু উপস্থিত থেকে প্রাণের আসরে
ভিড় জমা করা,
এই তো যথেষ্ট ছিল।

আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।
আমাদের ভাষার ইসারা
নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।
ঋতুর বদল হয়ে গেছে,—
বাতাসের উল্টো পাল্টা ঘটে'
প্রকৃতির হোলো বর্ণভেদ।
ছোটো ছোটো বৈষম্যের দল
দেয় ঠেলা,
করে হাসাহাসি।
রুচি আশা অভিলাষ
যা মিশিয়ে জীবনের স্বাদ,
তাব হোলো রস-বিপর্য্যয়।

আমাদেব সেকালকে যে-সঙ্গ দিয়েছি
যতই সামান্য হোক্ মূল্য তার
তবু সেই সঙ্গ-সূত্রে গাঁথা হয়ে মানুষে মানুষে
রচেছিল যুগের স্বরূপ,—
আমার সে সঙ্গ আজ
মেলেনা যে তোমাদের প্রত্যহেব মাপে।
কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।

তোমাদের যে বাসার কোণে থাকি
তার খাজনার কড়ি হাতে নেই।
তাই তো আমাকে দিতে হবে
বড়ো কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে।
উপস্থিত কালের যে দাবী
মিটাবার জন্যে সে তো নয়,
তাই যদি সেই দান তোমাদের রুচিতে না লাগে,
তবে তার বিচার সে পরে হবে।
তবু যা সম্বল আছে তাই দিয়ে
একালের ঋণ শোধ করে অবশেষে
ঋণী তারে রেখে যাই যেন।
যা আমার লাভ ক্ষতি হতে বড়ো
যা আমার সুখ দুঃখ হতে বেশি—
তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে যাই
স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে॥

২৭ আষাঢ়, ১৩৩৯

জরতী

হে জরতী,
অন্তরে আমার
দেখেছি তোমার ছবি।

অবসান রজনীতে দীপবর্ত্তিকার
স্থিরশিখা আলোকের আভা
অধরে ললাটে শুভ্র কেশে।
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যুষের তারা
মুক্ত বাতায়ন থেকে
পড়েছে নিমেষহীন নয়নে তোমার।
সন্ধ্যাবেলা
মল্লিকার মালা ছিল গলে
গন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে
বাতাসকে করুণ করেছে,—
উৎসবশেষের যেন অবসন্ন অঙ্গুলির
বীণা গুঞ্জরণ।
শিশির-মন্থর বায়ু,
অশথের শাখা অকম্পিত।
অদূরে নদীর শীর্ণ স্বচ্ছধারা কলশব্দহীন,
বালুতটপ্রান্তে চলে ধীরে,
শূন্য গৃহপানে
ক্লান্তগতি বিরহিণী বধূর মতন।
হে জরতী মহাশ্বেতা,
দেখেছি তোমাকে
জীবনের শারদ অম্বরে
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুক্ল লঘু স্বচ্ছ মেঘে।
নিম্নে শস্যে ভরা ক্ষেত দিকে দিকে,
নদী ভরা কূলে কূলে,
পূর্ণতার স্তব্ধতায় বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর।

হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণে ডুবিছে অতলে।
নিস্তরঙ্গ সিন্ধুনীরে
তীর্থস্নান করি'
রাত্রির নিকষ-কৃষ্ণ শিলাবেদী মূলে
এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।
চঞ্চলের অন্তরালে অচঞ্চল যে শান্ত মহিমা
চিরন্তন,
চরম প্রসাদ তার
নামিল তোমার নম্র শিরে
মানস সরোবরের অগাধ সলিলে,
অস্তগত-তপনের সর্ব্বশেষ আলোর মতন॥

২৯ আষাঢ়, ১৩৩৯

প্রাণ

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত্ত ঘুরে ওঠে।

সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব ॥

৩০ আষাঢ়, ১৩৩৯

সাথী

তখন বয়স সাত।
মুখচোরা ছেলে,
একা একা আপনারি সঙ্গে হোত কথা।
মেঝে বসে
ঘরের গরাদেখানা ধরে
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে
বয়ে যেত বেলা।
দূরে থেকে মাঝে মাঝে ঢঙ ঢঙ করে
বাজত ঘণ্টার ধ্বনি,

শোনা যেত রাস্তা থেকে সইসের হাঁক,
হাঁসগুলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে।
ও পাড়ার তেল-কলে বাঁশি ডাক দিত।
গলির মোড়ের কাছে দত্তদের বাড়ি
কাকাতুয়া মাঝে মাঝে উঠত চীৎকার করে' ডেকে।
একটা বাতাবি-লেবু একটা অশথ,
একটা কয়েৎবেল, একজোড়া নাবকেল গাছ
তারাই আমার ছিল সাথী।
আকাশে তাদের ছুটি অহরহ
মনে মনে সে ছুটি আমার।
আপনারি ছায়া নিয়ে
আপনার সঙ্গে যে-খেলাতে
তাদের কাট্‌ত দিন
সে আমারি খেলা।
তারা চিরশিশু
আমার সমবয়সী।
আষাঢ়ে বৃষ্টির ছাঁটে, বাদল হাওয়ায়,
দীর্ঘ দিন অকারণে
তারা যা করেছে কলরব
আমার বালকভাষা
হো হা শব্দ করে
করেছিল তারি অনুবাদ॥

তার পরে একদিন যখন আমার
বয়স পঁচিশ হবে,
বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে
ঐ জানালায়
বিজনে কেটেছে বেলা।

অশথের কম্পমান পাতায় পাতায়
যৌবনের চঞ্চল প্রত্যাশা
পেয়েছে আপন সাড়া।
সকরুণ মূলতানে গুন্ গুন্ গেয়েছি যে গান
রৌদ্রে ঝিলিমিলি সেই নারকেল ডালে
কেঁপেছিল তারি সুর।
বাতাবি ফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথীহারা রাতে
এনেছে আমার প্রাণে
দূর শয্যাতল থেকে
সিক্ত আঁখি আর কার উৎকণ্ঠিত বেদনার বাণী।
সেদিন সে গাছগুলি
বিচ্ছেদ মিলনে ছিল যৌবনের বয়স্য আমার॥

তার পরে অনেক বৎসর গেল
আরবার একা আমি।
সেদিনের সঙ্গী যারা
কখন্ চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে।
আবার আরেকবার জান্‌লাতে
বসে আছি আকাশে তাকিয়ে।
আজ দেখি সে অশ্বত্থ, সেই নারকেল
সনাতন তপস্বীর মতো।
আদিম প্রাণের
যে বাণী প্রাচীনতম
তাই উচ্চারিত রাত্রিদিন
উচ্ছ্বসিত পল্লবে পল্লবে।
সকল পথের আরম্ভেতে
সকল পথের শেষে

পুরাতন যে নিঃশব্দ মহাশান্তি স্তব্ধ হয়ে আছে
নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার
মন্ত্র ওরা প্রতিক্ষণে দিয়েছে আমার কানে কানে ॥

৩১ আষাঢ়, ১৩৩২

বোবার বাণী

আমার ঘরের সম্মুখেই
পাকে পাকে জড়িয়ে শিমুল গাছে
উঠেছে মালতীলতা।
আষাঢ়ের রসস্পর্শ
লেগেছে অন্তরে তার।
সবুজ তরঙ্গগুলি হয়েছে উচ্ছল
পল্লবের চিক্কণ হিল্লোলে।
বাদলের ফাঁকে ফাঁকে মেঘচ্যুত রৌদ্র এসে
ছোঁয়ায় সোনার কাঠি অঙ্গে তার,
মজ্জায় কাঁপন লাগে,
শিকড়ে শিকড়ে বাজে আগমনী।
যেন কত কী যে কথা নীরবে উৎসুক হয়ে থাকে
শাখা প্রশাখায়।
এই মৌন মুখরতা
সারারাত্রি অন্ধকারে

ফুলের বাণীতে হয় উচ্ছ্বসিত
ভোরের বাতাসে উড়ে পড়ে ॥

আমি একা বসে বসে ভাবি
সকালের কচি আলো দিয়ে রাঙা
ভাঙা ভাঙা মেঘের সম্মুখে ;
বৃষ্টি-ধোওয়া মধ্যাহ্নের
গোরুচরা মাঠের উপরে আঁখি রেখে ;
নিবিড় বর্ষণে আর্ত্ত
শ্রাবণের আর্দ্র অন্ধকার রাতে ;
নানা কথা ভিড় করে আসে
গহন মনের পথে,
বিবিধ রঙের সাজ,
বিবিধ ভঙ্গীতে আসা যাওয়া,
অন্তরে আমার, যেন
ছুটির দিনের কোলাহলে
কথাগুলো মেতেছে খেলায় ॥

তবুও যখন তুমি আমার আঙিনা দিয়ে যাও
ডেকে আনি, কথা পাইনে তো।
কখনো যদিবা ভুলে কাছে আসো
বোবা হয়ে থাকি।
অবারিত সহজ আলাপে
সহজ হাসিতে
হোলো না তোমার অভ্যর্থনা।
অবশেষে ব্যর্থতার লজ্জায় হৃদয় ভরে দিয়ে
তুমি চলে যাও,
তখন নির্জ্জন অন্ধকারে

ফুটে ওঠে ছন্দে গাঁথা সুরে ভরা বাণী,—
পথে তারা উড়ে পড়ে,
যার খুসি সাজি ভরে নিয়ে চলে যায়॥

৩ শ্রাবণ, ১৩৩৯

আঘাত

সোঁদালের ডালের ডগায়
মাঝে মাঝে পোকা-ধরা পাতাগুলি
কুঁক্‌ড়ে গিয়েছে ;
বিলিতি নিমের
বাকলে লেগেছে উই ;
কুরচির গুঁড়িটাতে পড়েছে ছুরির ক্ষত,
কে নিয়েছে ছাল কেটে ;
চারা অশোকের
নীচেকার ছুয়েকটা ডালে
শুকিয়ে পাতার আগা কালো হয়ে গেছে।
কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাঞ্ছনা,
তারি মাঝে অরণ্যের অক্ষুন্ন মর্য্যাদা
শ্যামল সম্পদে
তুলেছে আকাশ পানে পরিপূর্ণ পূজার অঞ্জলি।
কদর্য্যের কদাঘাতে
দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা,
সে সকলি অধঃসাৎ করে,
শান্ত প্রসন্নতা
ধরণীরে ধন্য করে পূর্ণের প্রকাশে।

ফুটিয়েছে ফুল সে যে
ফলিয়েছে ফল-ভার,
বিছিয়েছে ছায়া আস্তরণ,
পাখীরে দিয়েছে বাসা,
মৌমাছিরে জুগিয়েছে মধু,
বাজিয়েছে পল্লবমর্ম্মর।
পেয়েছে সে প্রভাতের পুণ্য আলো,
শ্রাবণের অভিষেক,
বসন্তের বাতাসের আনন্দ মিতালি,
পেয়েছে সে ধরণীর প্রাণ-রস,
সুগভীর সুবিপুল আয়ু,
পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্ব্বাদ।
পেয়েছে সে কীটের দংশন॥

৩ শ্রাবণ, ১৩৩৯

শান্ত

বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি
এসেছিল সংসার,
নাগাল পেল না তার।
আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
রেখেছে তাহারে ঘিরি।

হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয় গিরি।
সেথা অন্তরলোকে
সিন্ধুপারের প্রভাত আলোক
জ্বলিছে তাহার চোখে।
সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ
অপরূপ হয়ে জাগে।
তার দৃষ্টির আগে
বিরূপ বিকল খণ্ডিত যত কিছু
বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে
করে এসে মাথা নীচু ॥
সিন্ধুতীরেব শৈলতটের পরে
হিংসামুখর তরঙ্গদল
যতই আঘাত করে—
কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহালীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান,
গর্জ্জন এসে তোমার মাঝারে
হোলো ভৈরব গান।
তোমার চোখের গভীর আলোকে
অপমান হোলো গত
সন্ধ্যামেঘেব তিমির বন্ধে
দীপ্ত রবির মতো ॥

১৪ চৈত্র, ১৩৩৮

ভীরু

ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে
ব্যঙ্গ সুচতুর
বটেকৃষ্ট, ভীরু ছেলেদের বিভীষিকা।
একদিন কী কারণে
সুনীতকে দিয়েছিল উপাধি "পরমহংস" বলে।
ক্রমে সেটা হোলো "পাতিহাঁস"।
শেষকালে হোলো "হাঁসখালি।"
কোনো তার অর্থ নেই সেই তার খোঁচা।
আঘাতকে ডেকে আনে
যে নিরীহ আঘাতকে করে ভয়।
নিষ্ঠুরের দল বাড়ে,
ছোঁয়াচ লাগায় অট্টহাসে।
ব্যঙ্গ-রসিকের যত অংশ অবতার
নিষ্কাম বিদ্রূপ সূচি বিঁধে
অহৈতুক বিদ্বেষেতে সুনীতকে করে জরজর।

একদিন মুক্তি পেলো সে বেচারা,
বেরোলো ইস্কুল থেকে।
তারপরে গেল বহুদিন,—
তবু যেন নাড়ীতে জড়িয়ে ছিল
সেদিনের সশঙ্ক সঙ্কোচ।
জীবনে অন্যায় যত, হাস্যবক্র যত নির্দ্দয়তা
তারি কেন্দ্রস্থলে
বটেকৃষ্ট রেখে গেছে কালো স্থূল বিগ্রহ আপন।

সে কথা জান্‌ত বটু,
সুনীতের এই অন্ধ ভয়টাকে
মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে পেত সুখ
হিংস্র ক্ষমতার অহঙ্কারে ;
ডেকে যেত সেই পুরাতন নামে
হেসে যেত খলখল হাসি।

বি এল, পরীক্ষা দিয়ে
সুনীত ধরেছে ওকালতি,
ওকালতি ধরল না তাকে।
কাজের অভাব ছিল, সময়ের অভাব ছিল না,
গান গেয়ে সেতার বাজিয়ে
ছুটি ভরে যেত।
নিয়ামৎ ওস্তাদের কাছে
হোতো তার সুরের সাধনা।

ছোটো বোন সুধা,
ডায়োসিসনের বি, এ,
গণিতে সে এম, এ, দিবে এই তার পণ।
দেহ তার ছিপছিপে,
চলা তার চটুল চকিত,
চশমার নীচে
চোখে তার ঝলমল কৌতুকের ছটা,—
দেহমন
কূলে কূলে ভরা তার হাসিতে খুসিতে।

তারি এক ভক্তসখী নাম উমারাণী,
শান্ত কণ্ঠস্বর,
চোখে স্নিগ্ধ কালো ছায়া,
দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি তার হাতে।
পাঠ্য ছিল ফিলজফি,
সে কথা জানাতে তার বিষম সঙ্কোচ ॥

দাদার গোপন কথাখানা
সুধার ছিল না অগোচর।
চেপে রেখেছিল হাসি
পাছে হাসি তীব্র হয়ে বাজে তার মনে।
রবিবার
চা খেতে বন্ধুকে ডেকেছিল।
সেদিন বিষম বৃষ্টি,
রাস্তা গলি ভেসে যায় জলে,
একা জানালার পাশে সুনীত সেতারে
আলাপ করেছে সুরু সুরট মল্লার।
মন জানে
উমা আছে পাশের ঘরেই।
সেই যে নিবিড় জানাটুকু
বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে ॥
হঠাৎ দাদার ঘরে ঢুকে
সেতারটা কেড়ে নিয়ে বলে সুধা,
"উমার বিশেষ অনুরোধ
গান শোনাতেই হবে
নইলে সে ছাড়ে না কিছুতে।"

লজ্জায় সখীর মুখ রাঙা,
এ মিথ্যা কথার
কী করে যে প্রতিবাদ করা যায়
ভেবে সে পেল না॥

সন্ধ্যার আগেই
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ;
থেকে থেকে বাদল বাতাসে
দরজাটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগে কাঁচের সাসিতে ;
বারান্দার টব থেকে মৃদুগন্ধ দেয় জুঁই ফুল ;
হাঁটু জল জমেছে রাস্তায়,
তারি পর দিয়ে
মাঝে মাঝে ছলো ছলো শব্দে চলে গাড়ি।
দীপালোকহীন ঘরে
সেতারের ঝঙ্কারের সাথে
সুনীত ধরেছে গান—
নটমল্লারের সুরে,
—আওয়ে পিয়রওয়া,
রিমিঝিমি বরখন লাগে।—
সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাসা মিলে গেছে অখণ্ড সঙ্গীতে।
অন্তহীন কাল সরোবরে
মাধুরীর শতদল,—
তারপরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা॥

সন্ধ্যা হোলো।
বৃষ্টি থেমে গেছে;
জ্বলেছে পথের বাতি।
পাশের বাড়িতে
কোন্ ছেলে দুলে দুলে
চেঁচিয়ে ধরেছে তাব পরীক্ষার পড়া।

এমন সময় সিঁড়ি থেকে
অট্টহাস্যে এল হাঁক,
"কোথা ওবে, কোথা গেল হাঁসখালি।"
মাংসল পৃথুল দেহ বটেকৃষ্ট স্ফীত বক্ত চোখ
ঘরে এসে দেখে
সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বাবে নিঃসঙ্কোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে
স্থূল বিদ্রূপেব ঊর্ধ্বে
ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র যেন।
জোর করে হেসে উঠে
কী কথা বলতে গেল বটু.
সুনীত হাঁক্‌ল, "চুপ,"—
অকস্মাৎ বিদলিত ভেকেব ডাকেব মতো
হাসি গেল থেমে॥

৫ শ্রাবণ, ১৩৩৯

জলপাত্র

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত,
জানো তাহা, হে জীবননাথ।

তবুও সবার দ্বার ঠেলে
কেন এলে
কোন্ দুখে
আমার সম্মুখে।
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে
মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে
তীব্র দ্বিপ্রহরে
আসিতেছিলাম ধেয়ে আপনার ঘরে।
চাহিলে তৃষ্ণার বারি,
আমি হীন নারী
তোমারে করিব হেয়
সে কি মোর শ্রেয় ?
ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম করে
কহিলাম, অপরাধী করিয়োনা মোরে।
শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
হাসিয়া কহিলে, হে মৃণ্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা
সেই মতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমল চরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণ-রাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা ;
তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।

মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।
যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্ম্মল অভিরুচি
সেও কি অশুচি।
বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনাব হাতের সৃষ্টিতে
নিত্য তাব অভিষেক নিখিলেব আশিষ-বৃষ্টিতে।
জলভরা মেঘস্ববে এই কথা বলে,
তুমি গেলে চলে।
তাব পব হোতে
এ ভঙ্গুব পাত্রখানি প্রতিদিন উষাব আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্রবেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।
হে মহান্, নেমে এসে তুমি যাবে কবেছ গ্রহণ,
সৌন্দর্য্যেব অর্ঘ্য তার তোমা পানে করুক বহন॥

৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯

আতঙ্ক

বটেব জটায় বাঁধা ছায়াতলে
গোধূলি বেলায়
বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে
সাদাকালো দাগগুলো
দেখা দিত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে।

ওইখানে দৈত্যপুরী,
অদৃশ্য কুঠরি থেকে তার
মনে মনে শোনা যেত হাঁউমাউখাঁউ।
লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ
খিলি খিলি হাস্‌ত ডাইনি বুড়ি।
কাশিরাম দাস
পয়ারে যা লিখেছিল হিড়িম্বার কথা
ইঁট-বের-করা সেই পাঁচিলের পরে
ছিল তারি প্রত্যক্ষ কাহিনী।
তারি সঙ্গে সেইখানে নাককাটা সূর্পনখা
কালো কালো দাগে
করেছিল কুটুম্বিতা।

সতেরো বৎসর পরে
গিয়েছি সে সাবেক বাড়িতে।
দাগ বেড়ে গেছে,
মুগ্ধ নতুনের তুলি পুরোনোকে দিয়েছে প্রশ্রয়।
ইঁটগুলো মাঝে মাঝে খসে গিয়ে
পড়ে আছে রাশ-করা।
গায়ে গায়ে লেগেছে অনন্তমূল,
কালমেঘ লতা,
বিছুটির ঝাড়;
ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল।
পুরোনো বটের পাশে
উঠেছে ভেরেণ্ডাগাছ মস্ত বড়ো হয়ে।
বাইরেতে সূর্পনখা হিড়িম্বার চিহ্নগুলো আছে
মনে তারা কোনোখানে নেই॥

ষ্টেশনে গেলেম ফিরে একবার খুব হেসে নিয়ে।
জীবনের ভিত্তিটার গায়ে
পড়েছে বিস্তর কালো দাগ,
মূঢ় অতীতের মসীলেখা ;
ভাঙা গাঁথুনিতে
ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।
মাঝে মাঝে
যেদিন বিকেল বেলা
বাদলের ছায়া নামে,
সারি সারি তাল গাছে
দিঘির পাড়ীতে ;
দূরের আকাশে
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর
মেঘের গর্জ্জন ওঠে গুরু গুরু ;
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে বুনো খেজুরের ঝোপে,
তখন দেশের দিকে চেয়ে
বাঁকাচোরা আলোহীন পথে
ভেঙে-পড়া দেউলের মূর্ত্তি দেখি ;
দীর্ণ ছাদে, তার জীর্ণ ভিতে
নামহীন অবসাদ,
অনির্দ্দিষ্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেঁচা,
নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি যত,
দুর্ব্বলের স্বরচিত শত্রুর চেহারা।
ধিক্ রে ভাঙন্-লাগা মন,
চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথ্যা আঁচড় কেটেছে।
দুষ্টগ্রহ সেজে ভয়
কালো চিহ্নে মুখভঙ্গী করে।

কাঁটা আগাছার মতো
অমঙ্গল নাম নিয়ে
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে।
চারিদিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে
ভেঙে-পড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি
কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ ॥

৭ শ্রাবণ, ১৩৩৯

আলেখ্য

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটন-লেখায়।
নির্ব্বাকের গুহা হোতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,
যে সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দা প্রশংসার।
এই আস্পর্দ্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।
অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্ররূপ চলেছিল নানা কলরবে
নানা ছন্দে লয়ে
সৃজনে প্রলয়ে।

অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিত্বের মহা অন্তরাল,
পরশিল মোর ভাল
চুপে চুপে
অর্দ্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্ত্তিরূপে।
অমূর্ত্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।
ব্যথা কি কোথাও বাজে
মূর্ত্তির মর্ম্মের মাঝে।
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হোলো অস্তিত্বের সত্য মর্য্যাদায়।
যদিও তাই বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।
রূপের মরণ-ত্রুটি
আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভাবে,
আবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পাবে॥

৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯

সান্ত্বনা

সকালের আলো এই বাদল বাতাসে
মেঘে রুদ্ধ হয়ে আসে
ভাঙা কণ্ঠে কথার মতন।
মোর মন
এ অস্ফুট প্রভাতের মতো
কী কথা বলিতে চায় থাকে বাক্যহত।
মানুষের জীবনের মজ্জায় মজ্জায়
যে দুঃখ নিহিত আছে অপমানে শঙ্কায় লজ্জায়,
কোনো কালে যার অন্ত নাই,
আজি তাই
নির্য্যাতন করে মোরে। আপনার দুর্গমের মাঝে
সান্ত্বনার চির-উৎস কোথায় বিরাজে,
যে উৎসের গূঢ় ধারা বিশ্বচিত্ত অন্তস্তরে
উন্মুক্ত পথের তরে
নিত্য ফিরে যুঝে—
আমি তারে মরি খুঁজে।
আপন বাণীতে
কী পুণ্যে বা পারিব আনিতে
সেই সুগম্ভীর শান্তি, নৈরাশ্যের তীব্র বেদনারে
স্তব্ধ যা করিতে পারে।
হায়রে ব্যথিত
নিখিল আত্মার কেন্দ্রে বাজে অকথিত

আরোগ্যের মহামন্ত্র, যার গুণে
স্থজনের হোমের আগুনে
নিজেরে আহুতি দিয়া নিত্য সে নবীন হয়ে উঠে,—
প্রাণেরে ভরিয়া তুলে নিত্যই মৃত্যুর করপুটে।
সেই মন্ত্র শান্ত মৌনতলে
শুনা যায় আত্মহারা তপস্যার বলে।
মাঝে মাঝে পরম বৈরাগী
সে মন্ত্র চেয়েছে দিতে সর্ব্বজন লাগি।
কে পারে তা করিতে বহন,
মুক্ত হয়ে কে পারে তা করিতে গ্রহণ।
গতিহীন আর্ত্ত অক্ষমের তরে
কোন্ করুণার স্বর্গে মন মোর দয়া ভিক্ষা করে
ঊর্দ্ধে বাহু তুলি।
কে বন্ধু রয়েছ কোথা, দাও দাও খুলি
পাষাণকারার দ্বার—
যেথায় পুঞ্জিত হোলো নিষ্ঠুরের অত্যাচার,
বঞ্চনা লোভীর,
যেথায় গভীর
মর্ম্মে উঠে বিষাইয়া সত্যের বিকার।
আমিত্ব-বিমুগ্ধ মন যে দুর্ব্বহ ভার
আপনার আসক্তিতে জমায়েছে আপনার পরে
নির্ম্মম বর্জ্জনশক্তি দাও তার অন্তরে অন্তরে।
আমার বাণীতে দাও সেই সুধা,
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা॥
হেনকালে সহসা আসিল কানে
কোন্ দূর তরুশাখে শ্রান্তিহীন গানে

অদৃশ্য কে পাখী
বারবার উঠিতেছে ডাকি।
কহিলাম তারে, ওগো, তোমার কণ্ঠেতে আছে আলো,
অবসাদ আঁধার ঘুচালো।
তোমার সহজ এই প্রাণের প্রোল্লাস
সহজেই পেতেছে প্রকাশ।
আদিম আনন্দ যাহা এ বিশ্বের মাঝে
যে আনন্দ অন্তিমে বিরাজে,
যে পরম আনন্দলহরী
যত দুঃখ যত সুখ নিয়েছে আপনা মাঝে হরি
আমারে দেখালে পথ তুমি তারি পানে
এই তব অকারণ গানে॥

১১ শ্রাবণ, ১৩৩৯

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী

তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে,
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশ-পথে কোন্ সে পূবেন্ বায়ে
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হতে মিল্ল তারি মাঝে।
বিষ্ণু আমায় কইল কানে, বল্লে দশভুজা—
"অজানা ঐ সিন্ধুতীরে নেব আমার পূজা।"
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো
পূব সাগরে হাত বাড়িয়ে বল্লে, "চলো, চলো!"
রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে—
"আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে।"
তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা—
বল্লে, "আমি ঐ পারেতে বাঁধব নূতন বাসা।"
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইল আমার কানে—
"আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে।"—
সেদিন প্রাতে সুনীল জলে ভাস্ল আমার তরী,
শুভ্র পালে গর্ব্ব জাগায় শুভ হাওয়ায় ভরি।
তোমার ঘাটে লাগ্ল এসে জাগ্ল সেথায় সাড়া,
কূলে কূলে কানন-লক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া॥
প্রথম দেখা আব্ছায়াতে আঁধার তখন ধরা,
সেদিন সন্ধ্যা সপ্তঋষির আশীর্ব্বাদে ভরা।

প্রাতে মোদের মিলন-পথে উষা ছড়ায় সোনা,
সে পথ বেয়ে লাগ্‌ল দোঁহার প্রাণের আনাগোনা।
দুইজনেতে বাঁধ্‌নু বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বস্‌নু সেথায় একটি আসন পেতে॥
বিরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্ বরষের থেকে,
কালের রথের ধূলা উড়ে দিল আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে
ক্লান্ত হাতে রিক্ত মনে একা আপন তীরে।
বঙ্গসাগর বহু বরষ বলেনি মোর কানে
সে যে কভু সেই মিলনের গোপন কথা জানে।
জাহ্নবীও আমার কাছে গাইল না সেই গান
সুদূর পারের কোথায় যে তার আছে নাড়ীর টান॥
এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।
মুখের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
হয়েছিল রাখীবাঁধন সেদিন শুভপ্রাতে
সেই রাখী যে আজো দেখি তোমার দখিন হাতে।
এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
সে-চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে—
সেই সেদিনের প্রদীপ-জ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
নূতন-পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো॥

যবদ্বীপ
৪ ভাদ্র, ১৩৩৪

বোরো-বুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য্য এইমতো উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দন-মর্ম্মরে।
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীব স্বপ্নচ্ছবি॥
নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগ যুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা . সাধকেব ভক্তিব পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা,—
সর্ব্বকাল সর্ব্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে-ভাষার লিপির লিখন॥
সে-লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে-লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।
সে-লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম উদিত সূর্য্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।
অদূরে নদীর কিনারাতে
আল-বাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে ;—

আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণ-লীলা শাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।
কালের সে লুকাচুরি, তারি মাঝে সঙ্কল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,—
বলে অবিশ্রাম--
"বুদ্ধের শরণ লইলাম।"
প্রাণ যার দুদিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম,—
"বুদ্ধের শরণ লইলাম॥"
কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কত দিন,
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
বিপুল ইঙ্গিতপুঞ্জ-পাষাণের সঙ্গীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,--
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি—"বুদ্ধের শরণ লইলাম॥"

অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতি-কুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণ-বিলাসী,—

চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহঙ্কারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা;
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্দ্ধশ্বাসে মৃগয়া উদ্দেশে
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে,—
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া।
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া
তাই আসিয়াছে দিন,—
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,—
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌন-তটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—"বুদ্ধের শরণ লইলাম॥"

বোরো-বুদুর, যবদ্বীপ
৬ আশ্বিন, ১৩৩৪

সিয়াম

(প্রথম দর্শনে)

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্র মন্দ্র রবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে,

মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দ মুখর উদ্বোধন,—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্ত্তিতে, কর্ম্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্ত্তিতে
আত্মদান-সাধন স্ফূর্ত্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধন-মুক্তিতে,—
সে মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে
কবে এলো কেহ নাহি জানে,
অভাবিত অলক্ষিত আপনা-বিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থ সমীরণে ॥
সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখা-প্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্র ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসার-যাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুব কেন্দ্র সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে ;—
সর্ব্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে
এক ধর্ম্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।
সে বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নব যুগ যাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ ;

সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানস রত্নহার ॥
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবন মন্দির,
পদ্মাসন আছে স্থির
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা ॥

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে, –
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতি কুয়াশা
ভক্তির বিজয়-স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চ্চনার ভাষা।
সে অর্চ্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্ত্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,—
আজি আমি তারে দেখি লব,—
ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গন সীমা

অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থ জলে করি যাব স্নান,
তোমার জীবন-ধারা-স্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্য যুগ হতে—
যে যুগের গিরি-শৃঙ্গ-পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গল দিনকর॥

আশ্বিন ১৩২৪

সিয়াম

(বিদায়)

কোন্ সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত করেছে তব নাম,
হে সিয়াম,
বহু পূর্ব্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে।
মুহূর্ত্তে লয়েছি তাই চিনে
তোমারে আপন বলি,
তাই আজ ভরিয়াছি ক্ষণিকের পথিক অঞ্জলি
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।

চিরন্তন আত্মীয় জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়
তোমার ভক্তিতে তব মুক্তির আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে
যে অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে—
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্জ্বলিত ধূপে ॥
আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
দাঁড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগে আগে ॥
ইণ্টরন্যাশনাল বেলোয়ে
৩০ আশ্বিন, ১৩৩৪

বুদ্ধদেবের প্রতি

[সারনাথে নূতন বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত]

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি ॥

বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক্, মুক্ত হোক্ মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নব প্রাতে উঠুক্ কুসুমি॥

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক্ প্রাণবান।
খুলে যাক্ রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক্ শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্ত্তা শত কণ্ঠে উঠুক্ নিঃস্বনি
এনে দিক্ অজেয় আহ্বান॥

২৪ আশ্বিন, ১৩৩৮

পারস্যে জন্মদিনে

ইরান, তোমার যত বুলবুল
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দন বাণী॥
ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান

আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনাব বলি নিয়েছে তাহারে চিনে ॥
ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হোলো কবির জন্মদিন।
চিবকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমাব ললাটে পরান্থ এ মোব শ্লোক,—
ইরানের জয় হোক্ ॥

২৫ বৈশাখ, ১৩৩৯

ধর্ম্মমোহ

ধর্ম্মেব বেশে মোহ যাবে এসে ধবে
অন্ধ সে জন মাবে আব শুধু মবে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতাব বব
ধার্ম্মিকতার করে না আড়ম্বব।
শ্রদ্ধা কবিয়া জ্বালে বুদ্ধিব আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো ॥
বিধর্ম্ম বলি মারে পবধর্ম্মেবে
নিজ ধর্ম্মেব অপমান কবি ফেরে,—
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচাব নাহিক জানে,
পূজা-গৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা
দেবতার নামে এ যে সয়তান ভজা ॥

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্ব্বরতার বিকার বিড়ম্বনা,
ধর্ম্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জ্জনায় রচে তারা নিজ কারা,
প্রলয়ের ঐ শুনি শৃঙ্গধ্বনি
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জ্জনী ॥
যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,—
যে আনিবে প্রেম অমৃত উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে ॥
হে ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মবিকার নাশি
ধর্ম্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো, ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্ম্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো ॥

৩১ বৈশাখ, ১৩৩৩
রেলপথ